# অধ্যাপকের-বিপত্তি

শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ।

মূল্য—দেড় টাকা।

# নিবেদন।

—:*:—

যে গল্প মানুষের সুখদুঃখ, প্রেমের খণ্ডচিত্র এবং পাঠকের ভাবোদ্রেক করিয়া হৃদয় মুগ্ধ করে তাহাই উৎকৃষ্ট গল্প। কিন্তু আর এক প্রকার গল্প আছে যাহা ঘটনা-বৈচিত্র্য দ্বারা পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করিয়া চিত্তবিনোদন করে। ইংরাজিতে এপ্রকার গল্প প্রচুর, এবং উচ্চাঙ্গের না হইলেও কোন কোনটি বিশেষ উপভোগ্য। বাংলায় এ প্রকার গল্প রচনার সুযোগ কম, কারণ আমাদের বাস্তব জীবনেই বৈচিত্র্যের অভাব, কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, কাজেই বাংলায় এ ধরণের গল্প নিতান্ত বিরল না হইলেও যথেষ্ট নাই।

পাটনায় ডাঃ স্পুনারের আবিষ্কৃত সম্রাট অশোকের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের প্রতি, বাঙ্গালি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমার প্রথম গল্প "অধ্যাপকের বিপত্তি" লিখিয়াছিলাম। নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস না থাকায় Pearson's Magazine এ বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত একটি গল্পের মূল ঘটনা ডাঃ স্পুনারের আবিষ্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই ভিত্তিতে গল্পটি রচনা করি। উহা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইলে আমার পরিচিত অনেকে এবং অপরিচিত দুই একজন সহৃদয় ভদ্রলোক আমাকে পত্র লিখিয়া

গল্পটির প্রশংসা করেন। ইহাতেই আমার ধারণা হয় যে এ ধরণের গল্প আরও পাইলে পাঠকসম্প্রদায় সন্তুষ্ট হ'ন, তাই ক্রমে ক্রমে আরও চারিটি গল্প লিখিয়া ভারতবর্ষ ও মানসীতে পাঠাই।

আমার উদ্দেশ্য পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করা, গল্প-লেখক বলিয়া পরিচিত হওয়া নয়। তাই "বঙ্কু-মাষ্টার" গল্পটি লেখা শেষ হইবার পর কোন রুশ লেখকের গল্পে পাগলামির একটি চমৎকার চিত্র দেখিয়া তাহার অনুকরণে আমার গল্পের সর্ব্বশেষ ভাগ নূতন করিয়া লিখি। এক অন্ধকার রাত্রিতে হাজারিবাগের পথে সম্মুখের বৃক্ষরাজির উপর মোটরের আলো দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মাইতেছে দেখিয়া কোন এক বিস্মৃত গল্পের ছায়া মনে হয়, সেই সূত্রে "মায়ার ডোর" গল্পটি রচনা করি।

এই পুস্তকের পাঁচটি গল্প ঘটনা-বৈচিত্র্য মূলক হইলেও তাহারি কয়েকটি human interest অর্থাৎ মানুষের সুখদুঃখ বিজড়িত। গল্প কয়টি ক্ষণকালের জন্যও পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আশ্বিন, ১৩২৬। } বিনীত গ্রন্থকার

# অধ্যাপকের বিপত্তি।

স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য যে ছুটি লইয়াছিলাম তাহা শেষ হইলে যখন বাঁকিপুর বদলি হইলাম, তখন সেখানে প্লেগ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ অবস্থায় সদ্যোরোগমুক্ত দুর্ব্বল স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক বুঝিয়া স্থির করিলাম যে স্ত্রীকে তাহার পিতামাতার নিকট রাঁচিতে রাখিয়া আপাততঃ একাই বাঁকিপুর যাইব। এই মর্ম্মে শ্বশুর-মহাশয়কে চিঠি লিখিলাম এবং সাবধান করিয়া দিলাম যে বাঁকিপুরের প্লেগের কথা যেন সুরমাকে জানান না হয়।

জানাইলে কি রক্ষা ছিল? ডাক্তার-সাহেব হাওয়া বদলাইবার জন্য তাহাকে রাঁচি যাইতে বলিয়াছেন, এই ছুতা করিয়া যেদিন তাঁহার নিকট প্রথম বলি যে—আমি একাই বাঁকিপুর যাইব, সেদিন হইতে সুরমা আমার উপর যে প্রশ্নবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। "ডাক্তারের কি ভুল হয়

না? তোমার যত আধিখ্যেতা, অসুখ তো সকলেরই করে; রাঁচি না গিয়া কি কেউ ভাল হ'চ্ছে না? ডাক্তার সাহেব যদি আমাকে মক্কা পাঠাতে বল্‌তো, তুমি পাঠাতে? আচ্ছা আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েই দেখ না,—সেখানে যদি ভাল না থাকি তখন না হয় রাঁচি পাঠিয়ে দিও"—ইত্যাদি কথার সদুত্তর দিতে সময় সময় আমার প্রত্যুৎপন্নমতিকে বিপন্ন হইতে হইত। ইহার উপর, সুরমা যদি প্লেগের খবর শুনিত তাহা হইলে মস্ত অনর্থ ঘটাইত, সন্দেহ নাই।

অনেক বলিয়া কহিয়া তাহাকে সম্মত করাইয়া যদি বা রাঁচি লইয়া গেলাম, সেখানে শ্বশুর-মহাশয় আবার এক বিপদে ফেলিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কুশলপ্রশ্নাদির পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে বাঁকিপুরের কোথায় বাসা ঠিক করলে?"

আমি—"সেখানে আমার জানাশুনা কেউ নেই, কাজেই বাসা ঠিক করা হয় নি। এখন গিয়ে ডাকবাংলায় উঠ্‌ব; তারপর একটা বাসা ঠিক করে নেব, মনে ক'রেছি।"

শ্বশুর-মহাশয়, মোটা চুরটটি মুখ হইতে হস্তে লইলেন এবং চশমার উপর দিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে কি, বাসা না ঠিক ক'রে কি যাওয়া হয়! একে বাঁকিপুরে বাঙ্গালী-পছন্দ বাড়ী খুব কম, তার উপর বল্‌তে গেলে ঘরে ঘরে প্লেগ

হ'চ্ছে। ভাল করে না জেনে, কোন বাড়ীতে বাস করা উচিত নয়; তুমি নূতন লোক, সেখানে গিয়ে যে সুবিধামত বাড়ী পাবে তার সম্ভাবনা খুব কম। আমি আগে জান্‌লে, আমাদের গঙ্গাধরকে লিখে একটা ভাল বাড়ীর বন্দোবস্ত কর্‌তে পার্‌তুম। তুমি আজ বাদে কাল যাবে, এখন তো আর সময় নেই।"

অতিশয় চিন্তিত হইয়া শ্বশুর-মহাশয় ঘন ঘন চুরুট টানিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—"তুমি এক কাজ কর না কেন?—গঙ্গাধরের বাসায় গিয়ে থাক না। সেখানে বেশ নিজের বাড়ীর মত থাক্‌বে, কোন কষ্ট হবে না;—ওঃ, গঙ্গাধর কে বুঝতে পারনি বুঝি? ঐ যে বাঁকিপুর কলেজের প্রোফেসার গঙ্গাধর গুপ্ত, তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?"

আচার্য্য গঙ্গাধর গুপ্ত মহাশয়ের নাম, ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা অবশ্য শিক্ষিতসমাজের সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না, সুতরাং কি সূত্রে সেই নিরপরাধ ব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করিব, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—"তাঁর সঙ্গে তো আমার জানাশুনা নেই; কি ক'রে তাঁর কাছে থাক্‌ব?"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন—"সেজন্য কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। তার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার খুব হৃদ্যতা আছে।

আমার অনেক আত্মীয়-কুটুম্বের চেয়ে সে আপনার লোক; তার স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর মেয়েদেরও খুব আত্মীয়তা আছে। তুমি তাদের কাছে থাকলে তারা খুব সুখী হবে আমরাও নিশ্চিন্ত থাকব। তারপর যখন মেয়েদের নিয়ে যাবে, তখন অবশ্য আলাদা বাসা কোরো। কি বল, তা হলে গঙ্গাধরকে টেলিগ্রাফ করে দি?"

অপরিচিত লোকের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, শ্বশুর মহাশয় আর পীড়াপীড়ি করিলেন না বটে কিন্তু পরে শ্বশুর-কন্যার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। "তুমি নাকি বাঁকিপুরের জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ীতে থাকতে রাজি হও নি? আমি বরাবর দেখে আসছি, যে কাজটি তোমার ভালর জন্যে করতে বলা যায় তাতেই তুমি বেঁকে বস। যা ভাল বোঝ করগে, আমি কিছু জানি না।" অগত্যা সম্মতি দিতে হইল, এবং গঙ্গাধর বাবুর নিকট টেলিগ্রাফ প্রেরিত হইল। আমি সুরমার রোগপাণ্ডু কপোল হইতে অশ্রু মুছাইয়া, নিজের শরীরে যত্ন করিব, প্রত্যহ পত্র লিখিব, অসুখ হইলে টেলিগ্রাফ করিয়া খবর দিব ইত্যাদি অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়া বাঁকিপুর যাত্রা করিলাম।

২

বাঁকিপুরে আসিয়া বাস্তবিকই বাড়ীর মত সচ্ছন্দে আছি।

# অধ্যাপকের বিপত্তি।

অধ্যাপক গঙ্গাধর বাবুর সহজ সস্নেহ ব্যবহারে ও তাঁহার পত্নীর অকৃত্রিম যত্নে আমার সঙ্কোচের ভাব অল্প দিনেই অন্তর্হিত হইল। গঙ্গাধর বাবু স্বয়ং বড় একটা যত্ন বা আত্মীয়তা দেখাইবার সময় পান না ; কারণ,তিনি কলেজের সময় ব্যতীত অন্য সময় লেখাপড়া লইয়াই থাকেন, সংসারের কোন খোঁজ রাখেন না। তাঁহার শয়ন-গৃহের সংলগ্ন একটি অনতিপ্রশস্ত ঘর আছে, তাহার মধ্যে কাঠের মঞ্চে রাশিরাশি পুস্তক সজ্জিত, অন্য আসবাবের মধ্যে একটা পুরাতন টেবিল ও দুই একখানা পুরাতন চেয়ার এবং মেজেতে একখানা পাটির উপর একটা তাকিয়া। সেই ঘরেই তিনি প্রায় সমস্ত দিন পাঠে নিমগ্ন থাকেন। ইনি একটি প্রকৃত গ্রন্থকীট হইলেও, গ্রন্থকীটের আকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা ছিল, তাহার সহিত ইঁহার কোন সাদৃশ্য দেখিলাম না। ইঁহার সুদীর্ঘ বপু, শ্মশ্রুবহুল গম্ভীর মুখ ও ভাবপূর্ণ চক্ষু দেখিলে, মনে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয় ; তাহার উপর ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া আমার মত অশ্রদ্ধাতন্ত্রীর মনও অল্পদিনেই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। এত গাম্ভীর্য্যের সহিত এরূপ সরলতার সমাবেশ হইতে পারে, এত বিদ্যার সহিত এরূপ নিরহঙ্কার থাকিতে পারে তাহা জানিতাম না। দেখিলাম, তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি প্রগাঢ়, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে একটু উত্তেজিত করিলেই তাঁহার প্রাণের উৎস খুলিয়া যায়, মুখ হইতে মর্ম্মস্পর্শী কথার স্রোত বহিতে থাকে,

ভাবাবেগে তিনি আত্মহারা হইয়া যান। এই একটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহাকে উত্তেজিত হইতে দেখি নাই। ভদ্রলোকের প্রকৃতি এত শান্ত ও নিরীহ যে, কখনও কাহাকেও প্রতিবাদ করিতে পারেন না, নিজের চাকরদের ফরমাস করিতেও ইতস্ততঃ করেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে, বা কলহ করিলে, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন, শ্মশ্রু মধ্যে বারংবার অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে দীন নয়নে চাহিয়া থাকেন।

গঙ্গাধর বাবুর পত্নী নিজেকে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর স্থলাভিষিক্ত মনে করেন সুতরাং আমার সহিত কথা কহেন; তাঁহার আড়ম্বরহীন আন্তরিক যত্নে আমি যে প্রবাসে আছি, তাহা মনেও হয় না। এই শান্তস্বভাবা, স্বল্পভাষিণী, সেবাপরায়ণা, স্নেহময়ী রমণীটি গঙ্গাধর বাবুর সংসারকে সচল, সম্পূর্ণ ও শোভন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিদুষী নহেন, কিন্তু কায়মনোবাক্যে সেবা দ্বারা স্বামীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও তাঁহাকে সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া, তিনি যে গঙ্গাধর বাবুর বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ সহায়তা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আমি জ্যাঠাই মা বলিয়া সম্বোধন করি।

একদিন রাত্রিকালে আমরা দুই জনে আহারে বসিয়াছি, গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী নিকটে বসিয়া আমাদের খাওয়াইতেছিলেন।

তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- "আজ তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে কেন?

গঙ্গাধর বাবু বলিলেন,—"আজ সমস্ত দিন মাথাটা বড় ধরে আছে।"

সস্নেহ অনুযোগের স্বরে গৃহিণী বলিলেন—"মাথা ধরার আর অপরাধ কি বল? চিরকাল শরীরের উপর এত অত্যাচার সহ্য হবে কেন? আমি এত বলি, রাত্তিরে পড়া কমিয়ে দাও, রোজ একটু বেড়াতে যাও, তা তো শুনবে না। আগে বরং মাঝে মাঝে একটু বেড়াতে, আজকাল তাও গিয়েছে; সেই গেল মাসে পুরাণ রাজবাড়ী দেখতে গিয়েছিলে, তার পর আর এক দিনও তো বেড়াতে যাও নি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পুরাণ রাজবাড়ী? সে আবার কোথা?"

গঙ্গাধর বাবু—"পুরাণ রাজবাড়ী বুঝলে না? পাটলীপুত্রের Excavation কে। Excavation নিশ্চয়ই দেখে এসেছ; কেমন,—খুব interesting নয়?"

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম বটে, বাঁকিপুরের নিকটে খনন করিয়া, প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ও সকল বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল না থাকায়, সে সংবাদ মনোযোগের সহিত পড়ি নাই এবং এখানে আসিয়াও সে

বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করি নাই। আমি বলিলাম—"না, ও সব কিছু আমি দেখি নি। সে কোথায়, কোন্ দিকে, তা জানি না।"

গঙ্গাধর বাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—, "সে কি! তুমি এতদিন এখানে এসেছ, আর ক্রোশ খানেক দূরে এই বহু-পুরাতন কীর্ত্তি রয়েছে, যা সাহেবদের কাছে একটা প্রধান দ্রষ্টব্য ব্যাপার, যা দেখতে কত Tourist এখানে আসে বাঁকিপুরে থাকবার সময় ছোট লাট সাহেব যা প্রায়ই দেখতে যান, তা তুমি দেখতে যাওনি? আশ্চর্য্য!"

আমি বড় অপ্রতিভ হইলাম। গঙ্গাধর বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার স্ত্রীর চক্ষু এড়াইল না। সামলাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"নরেন এখানে নতুন এসেছে, ও এখানকার খবর কি করে জানবে? তোমারই উচিত ছিল, দেখিয়ে নিয়ে আসা। কাল তো রবিবার আছে, সঙ্গে করে নিয়ে যাও না কেন?"

তাহাই স্থির হইল। গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, পরদিন বৈকালে আমাকে কুমরাহারে পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া লইয়া আসিবেন।

৩

কুমরাহারে পৌঁছিয়া গঙ্গাধর বাবু প্রথমে খননকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বাবুর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সে ভদ্রলোক সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলেও আমাকে সঙ্গে লইয়া, যাহা যাহা দ্রষ্টব্য, যত্নের সহিত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। পারস্যদেশে দরায়ুসের শতস্তম্ভ সভাগৃহের সহিত এস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত সভাগৃহের কি কি সাদৃশ্য, অগ্নিদাহে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছাদ নষ্ট হইয়া গেলে কি করিয়া পাষাণ-স্তম্ভগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, সেই অগ্নিদাহের ভস্মের চিহ্ন এখনও মৃত্তিকাগাত্রে কিরূপ সুস্পষ্ট বর্ত্তমান, দরায়ুসের সভাগৃহের স্তম্ভের গাত্রে যেরূপ শিল্পীদিগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে, অবিকল সেইরূপ চিহ্ন এই স্থানের স্তম্ভের কোথায় বর্ত্তমান, চন্দ্রগুপ্তের পাষাণ-প্রাসাদ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেলে, ঠিক সেইস্থানেই গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা যে ইষ্টক প্রাসাদ-নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রাচীরাদি এখনও কিরূপ অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে, এই খননকার্য্যের কর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী স্পুনার সাহেবের এই কার্য্যে কিরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ ও আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে তাঁহার কিরূপ গভীর জ্ঞান ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া, ইঞ্জিনিয়ার বাবু শেষে হাসিয়া বলিলেন— "আমার মুখে আর কি শুনবেন? যে লোকের সঙ্গে এসেছেন,

তাঁর কাছে শুন্নুন, পাঁচটা নূতন কথা জানতে পারবেন। স্পুনার সাহেব বলেন, Archæologyতে গঙ্গাধর বাবু একজন রীতিমত পণ্ডিত। সেদিন মাটির ভিতর থেকে এক রকম ভাঁড় পাওয়া গেল, দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের আস্কের খুরীর মত। স্পুনার সাহেব হেসে বল্লে—'এ জিনিসটা কি তা কেউ সহজে বলতে পারবে না, গঙ্গাধর বাবু বলতে পারেন কি না দেখি।' গঙ্গাধর বাবু সেটাকে নেড়ে চেড়ে বল্লেন—'এ তো "স্বস্তি" দেখতে পাচ্ছি। সেকালে সেনাপতিরা যুদ্ধজয় করে এলে রাজা এই স্বস্তির ভিতর নবরত্ন দিয়ে এটাকে হল্‌দে কাপড়ে মুড়ে সেনাপতিকে দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন।' এই ব্যাখ্যা শুনে, স্পুনার সাহেবের মহা আনন্দ, শেকহ্যাণ্ড্ করে গঙ্গাধর বাবুর হাত ছিঁড়ে দেবার উপক্রম করেছিল।"

Excavationএর সমস্ত দেখা হইয়া গেলে, ব্যাপারটার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। গঙ্গাধর বাবুর মুখে শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, না জানি কারুকার্য্যখচিত কি প্রকাণ্ড পুরীই দেখিব, কিন্তু আসলে দেখিলাম, কেবল একটা শিল্পলেশহীন পাতরের থাম, কতকগুলা পাতরেরকুচির ছোট ছোট স্তূপ, কতকলা মাটির ভাঁড় ও সরা এবং নিতান্ত আধুনিক ধরণের প্রাচীরের সারি,—ইহার জন্য এত হৈ চৈ, এত অর্থব্যয়! আমি বলিলাম—"যে টাকাটা নষ্ট করে এই প্রকাণ্ড খাত খুঁড়েছে,

সেই টাকা খরচ করে যদি জলাশয়-প্রতিষ্ঠা ক'রত, তা হ'তে একশত গ্রামের চিরকালের জন্য জলকষ্ট দূর হয়ে যেত।"

গঙ্গাধর বাবু আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন—"তোমার মুখে ও কথা শুনব আশা করিনি, নরেন! একবার মনে করে দেখ দেখি, কোথায় দাঁড়িয়ে আছ! আড়াই হাজার বছর আগে সেই দিব্যপুরুষ, 'আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর', যে ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, 'এই পাটলীগ্রাম কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর হবে' তা অমোঘ সত্যে পরিণত হয়েছিল; সাতশো বছর ধরে পাটলীপুত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল; সুখ, সভ্যতা, শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল; ধর্ম্ম বল, আইন বল, শাস্ত্র বল, বিজ্ঞান বল, ফ্যাশান্ বল, সমস্তই এই পাটলীপুত্র থেকে সমগ্র ভারতে প্রচার হ'ত, বিশাল ভারতসাম্রাজ্য এই খান থেকে শাসিত হ'ত; এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার বিদ্যার্থীরা দেশবিদেশে জ্ঞানালোক নিয়ে যেত, হাজার হাজার ক্রোশ দূর থেকে বিদেশী পর্যাটকেরা পাটলীপুত্র দেখ্‌তে আস্‌তো; আর এর সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক্ হয়ে যেত। একা পাটলীপুত্রেই ছয় লক্ষ পদাতিক সৈন্য, ত্রিশহাজার ঘোড়সওয়ার, হাজার নৌসেনা, আর দশহাজার হাতী থাকত। কাঠের পাঁচিলের মধ্যে খাস সহরে পাঁচ লক্ষ লোক থাক্‌ত—এই যে লণ্ডন, প্যারিস্, নিউ-ইয়র্ক, বার্লিন্—এদের মধ্যে কোন্ সহর পাটলীপুত্রের মত সাতশো

বছর ধ'রে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ও সভ্যজগতের মুকুট হয়ে আছে, বা ছিল? একবার মনের ভিতর তখনকার ছবি আঁকবার চেষ্টা করে দেখ দেখি।"

"পাটলীপুত্র কেমন ছিল, এখন একটু একটু মনে হচ্ছে কি? সেই সভ্যজগতের মুকুট পাটলীপুত্র—তার মধ্যমণি যে রাজ-প্রাসাদ, যেখানে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত, বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি অশোক, আর তাঁদের পরবর্ত্তী মৌর্য্য সম্রাটেরা বাস করিতেন, সেই রাজপ্রাসাদ এইখানে ছিল; যেখানে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা ছিল, ঠিক সেইখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। তখনকার দিনের বিশ্ববিখ্যাত সুসা ও একবাটানার রাজপ্রাসাদের চেয়ে এই প্রাসাদ ঐশ্বর্য্য ও শোভা সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিল। ওই যে পাথরের থাম্‌টা পড়ে আছে, ওইটি রাজসভার একশো থামের একটি ছিল; অন্য অন্য থাম-গুলি কোথায় ছিল, তা মাটির্ পিল্‌পে দিয়ে নির্দ্দেশ করে দিয়েছে; সুতরাং, রাজসভার আকৃতিটা আমরা কতকটা ধারণা করতে পারি। বিদেশী পর্য্যটকেরা লিখে গেছেন এই থামগুলির রং সোণালি ছিল, থামগুলির গায়ে সোণার লতা জড়ান তার স্থানে স্থানে রূপার পাখী; এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে মনোহর বৃক্ষলতাগুল্মশোভিত বিস্তীর্ণ বাগান ছিল তার মাঝে মাঝে বিচিত্র মৎস্যপূর্ণ কৃত্রিম হ্রদ; উৎসবাদিতে এই সভাগৃহ মণিমুক্তাখচিত সোণার নানারূপ পত্রে,—তার কোন কোনটি চার হাত চওড়া,—

রত্নখচিত তাম্রপত্রে, স্বর্ণরৌপ্যখচিত বিচিত্র বর্ণের মহার্ঘ বসন-ভূষণে ঝলমল করত।

"এই রাজসভাতেই মহারাজ অশোক বস্‌তেন—যাঁর সময়ে ভারত-সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য মধ্যগগনে পৌঁছেছিল ! যাঁকে, কি শাসন-চাতুর্য্যে, কি জনহিতে, কি ধর্ম্মবলে, কোন দেশের কোন রাজা অতিক্রম কর্‌তে পারেন নি ; যিনি বিনা-রক্তপাতে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে বুদ্ধদেবের একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপনা করেছিলেন, স্তম্ভে স্তূপে শিলালিপিতে যাঁর গম্ভীর ঘোষণা-বাণী আড়াই-হাজার বছরের অনাদরসত্ত্বেও আজও সেই রাজর্ষির ধর্ম্মবুদ্ধি ও পরাক্রমের পরিচয় দিচ্ছে। আবার একদিন এসেছে, যেদিন এইখান থেকেই সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিপুল-বাহিনী, সমুদ্র-গর্জ্জনে ধাবিত হয়ে, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও সমস্ত দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করেছে,—সে ভীষণ-স্রোতের মুখে অতিবড় রাজাদেরও তৃণের মত ভেসে যেতে হয়েছিল ;—

"এসেছে সে একদিন  
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে,  
না রাখে কাহারও ঋণ।  
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—  
চিত্ত শঙ্কাহীন।"

"যে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের নিকট, হিমালয় থেকে সেতু-

বঙ্গ পর্য্যন্ত সকল রাজাকে পদানত হ'তে হ'য়েছিল; এমন কি, চিরস্বাধীন দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতিরাও যাঁর নাম শুনলে কাঁপত, সেই সমুদ্রগুপ্ত এইখানে থাকতেন।

"এখন বুঝতে পারছ কি, এই জায়গার কি মহিমা, এই ভাঙ্গা-থাম, ইটের প্রাচীরের কি মূল্য? যে চাণক্যের নাম দু-হাজার বছর ধরে ভারতের আবালবৃদ্ধ-মহিলার কাছে তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপমা-স্থল হ'য়ে আছে, সেই চাণক্য এই রাজসভায় ব'সে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে মন্ত্রণা দিতেন, যার ফলে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত, সুদৃঢ়, আর পরাক্রান্ত হ'য়েছিল; সাতশো বছর ধ'রে সম্রাটেরা এইখান থেকে যে হুকুম দিতেন, সেই হুকুম-অনুসারে কোটি-কোটি প্রজা শাসিত হত;—কোনও হুকুমে কোটি-কোটি প্রজার সুখসম্পদ্ বেড়েছে, কোনও হুকুমে বা কোটি-কোটি প্রজা হাহাকার করেছে!—এইখানে ব'সে সম্রাটেরা কত সমর অভিযানের সংকল্প করেছেন, যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ সংসার অনাথ হয়েছে, শত শত রাজা রাজ্য হারিয়েছে!—এই সভায় ব'সে সম্রাট্ অশোক তাঁর নানা জনহিতকর কাজের ও তাঁর বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি স্তম্ভস্তূপ-শিলালিপি-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেছেন,—সর্ব্বধ্বংশী কালের করাল হস্তও যার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। এইখানে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মহারাজ অশোককে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের, সঙ্ঘারাম-মঠ-মন্দির প্রভৃতি

নির্ম্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন। আবার এইখানেই, কোনও জায়গায় বসে, সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ের আয়োজন করেছেন। জানিনা পৃথিবীর আর কোথাও এমন প্রাসাদ বা ধ্বংসাবশেষ আছে, যেখানে এত যুগ ধ'রে কোটি কোটি লোকের সুখ-সম্পদ্, জ্ঞান-বিদ্যা, জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। থিবস্ বল, ব্যাবিলন বল, নিনেভে বল, কার্থেজ্ বল, পিকিন্ বল,—কোথাও এমন বিচিত্র সমাবেশ দেখি না। যখন মনে করি—এই পাটলীপুত্র আর তার মহিমা, নিতান্ত আমাদেরই —তখন বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।"

গঙ্গাধর বাবুর স্বর কম্পিত হইতেছিল, তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল! সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমরা নীরবে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

( ৪ )

সেই দিন হইতে প্রায়ই বৈকালে Excavationএর দিকে বেড়াইতে যাই এবং ইঞ্জিনিয়ার বাবুটির সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বড়ই মুক্তপ্রাণ, সদালাপী ভদ্রলোক; দেখা হইলেই নানা-বিষয়ে আলাপ করেন। খনন করিতে করিতে, কোন দিন নূতন কিছু বাহির হইলে, যত্নসহকারে দেখান—কোন দিন কথায় কথায়

সন্ধ্যা হইয়া গেলে, কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহার অনতিদূরবর্ত্তী বাঙ্গালায় লইয়া যাইয়া অতিথি-সংকার করেন। একদিন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বলিলেন—"কাল খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে একটা বেদির মত ইটের ঢিপি পাওয়া গিয়েছে; তার উপর কতকগুলা ছোটবড় নুড়ি ছিল—সেগুলার জায়গায় জায়গায় সিঁদুরের দাগ, আর বেদিটার আশে পাশে কতকগুলা মানুষের হাড় পড়ে আছে। আমার বোধ হয়, সেখানটায় কোন কাপালিকের আশ্রম ছিল।" এই সংবাদ শুনিয়া, ব্যাপারটা দেখিবার জন্য, আমি অত্যন্ত উৎসুক হওয়ায় বিহারী বাবু আমাকে তথায় লইয়া গেলেন; কিন্তু তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কুলিরা তাহাদের রোজের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজের কাজে বাঙ্গলায় চলিয়া গেলেন। আমি গভীর খাতের মধ্যে নামিয়া তথা-কথিত কাপালিকের বেদি, তাহার উপরিস্থিত পাথরগুলি, এবং ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নরকঙ্কাল মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলাম। বেদিটিকে মাটির স্তূপ বলিয়াই মনে হইল; তাহার চারিদিকের মাটি কতক পরিষ্কার হইয়াছে মাত্র – কঙ্কালগুলার কোন কোন অংশ মৃত্তিকাসার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আকার ঠিক বজায় আছে। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায়, ধৌত হইয়া, একটা শ্বেত নরকপাল, গোধূলির কালিমা ভেদ করিয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমার 'ছায়াময়ী'র প্রমথগণের গান মনে পড়িল—

"চলে কপাল ধঃ ধঃ ধঃ ধঃ
কার মাথা এটা হি হি হি হঃ
ধাকিটী ধিকিটী ধিমিয়া।
রাজা কি রাখাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।"

স্বল্পালোকে সেই জনশূন্য ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়াইয়া যুগযুগান্তর পূর্ব্বের কোন বিস্মৃত সাধকের ইহলোকের শেষ চিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল—কোনরূপে কালের যবনিকা সরাইয়া এব্যক্তি কতদিন পূর্ব্বে জীবিত ছিল, তাহার আকার-প্রকার কিরূপ ছিল, তখন এই পাটলীপুত্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, পাটলীপুত্রে তখন কে সম্রাট বা রাজা ছিলেন ইত্যাদি জানিয়া লই।

পাথরগুলির উপর সিন্দুর চিহ্ন দেখিবার জন্য সেগুলির এক একটি বেদির উপর হইতে উঠাইয়া আবার রাখিয়া দিতেছিলাম; এমন সময়, বেদির উপরিস্থিত মৃত্তিকায় প্রোথিত কোন কঠিন তীক্ষ্ণ বস্তুতে লাগিয়া হস্তে সামান্য আঘাত পাইলাম। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বৃষ্টিতে এক স্তর মাটি ধুইয়া যাইয়া কি একটা পদার্থের কোণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি, পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া, উহার চারিদিকের মাটি খুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে একটা ছোট বাক্সের মত চতুষ্কোণ জিনিস বাহির হইল। যতটুকু আলো ছিল, তাহার সাহায্যে এবং স্পর্শে বুঝিলাম, উহা সম্ভবতঃ ধাতুনির্ম্মিত কোনরূপ আধার; উহার উপরটা অত্যন্ত বন্ধুর এবং ক্ষুদ্র হইলেও বেশ ভারি। আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল; আলোতে লইয়া গিয়া জিনিষটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। প্রথমে ইচ্ছা হইল, excavationএর কর্ম্মচারিদের নিকট জিনিষটা লইয়া যাই; কিন্তু তখনই মনে হইল যে, তাহা হইলে জিনিষটাকে তাঁহাদের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে, ইহার মধ্যে কি আছে তাহা দেখিতেও পাইব না, হয়তো লোকে জানিবেও না যে, আমি ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। তাহার উপর যখন মনে হইল—ইহা পাইলে গঙ্গাধর বাবু কিরূপ আহ্লাদিত হইবেন, তখন আর কোন দ্বিধা রহিল না; জিনিষটা কোটের পকেটে ফেলিয়া বাসায় যাইবার জন্য বাহির হইলাম। পথে একবার মনে হইয়াছিল, কাজটা ভাল হইল না; কিন্তু ইহাতে স্পুনার সাহেবের, রতন টাটার এবং গবর্ণমেণ্টের যে অধিকার, আমারও সেই অধিকার আছে, ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

"Excavationএ মাটির ভিতর থেকে একটা জিনিষ পেয়েছি"—বলিয়া হঠাৎ জিনিষটা গঙ্গাধর বাবুর সম্মুখে রাখিলে, তিনি প্রথমে কথাটা যেন সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন না এই ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে কিছুক্ষণ ধরিয়া জিনিষটা

অনিমেষ নয়নে দেখিলেন, তাহার পর, উহা সন্তর্পণে হাতে লইয়া, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল, বলিলেন—"এটা সত্য সত্যই বহুপুরাতন জিনিষ দেখ্‌ছি; কোন রকম কৌটা বা আধার—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর গায়ে এই সব দাগ গুলা, inscription বলে বোধ হচ্ছে।" তাহার পর সেটা কাণের কাছে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"এর ভিতর একটা কিছু কাছে, বোধ হ'চ্ছে। কে জানে?—অসম্ভব নয়—হয়তো এর ভিতর বুদ্ধদেবের অস্থি আছে! পুরাকালে একটা কিম্বদন্তি ছিল যে, যেখানে Excavation হচ্ছে, তার কাছাকাছি কোন জায়গায় বুদ্ধদেবের শরীরের কোন অংশ আছে; কিন্তু কোথায় আছে,—তা এপর্য্যন্ত কেউ বল্‌তে পারে নি। তুমি এটা কোন জায়গাটায় পেলে, বল দেখি।"

আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলে, তিনি বল্লেন—"কাপালিক আবার কি? বৌদ্ধেরা শেষদিকে খুব তান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল বটে, মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে খুব কারবার ক'রত; কিন্তু বৌদ্ধ-কাপালিকের কথা ত শোনা যায় না। যাই হক, কৌটাটা খুল্‌তে হ'বে; কিন্তু সে বড় সোজা কথা নয়, ডালাটা বন্ধ হয়ে এঁটে আছে। আর খুব সাবধানে এটাকে পরিষ্কার করে দেখতে হবে গায়ে কিছু লেখা আছে কি না।"

এতক্ষণ কৌটাটা বাটী লইয়া আসার ন্যায়ান্যায়ের কথা তাঁহার মনে হয় নাই; এখন হঠাৎ সে কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি একেবারে দমিয়া গিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কিন্তু এতো আমি খুলিতে পারি না, রাখিতেও পারি না; তুমি এটা কেন নিয়ে এলে? জাননা ওখান থেকে এক খানা ইট পর্য্যন্ত সরান—' punishable by law? এটা এখনই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত; কিন্তু তা হলে আবার তোমাকে জড়াতে হয়। এখন করি কি?"—বড়ই বিচলিত হইয়া তিনি পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন; আমি বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলাম এবং অত্যন্ত উৎসাহের সময়ে ভৎ'সিত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে শয়ন করিলাম।

কিছু পরেই তিনি, চটিজুতার চটপট শব্দ করিতে করিতে, আমার ঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,"নরেন, নরেন,—ঘুমুলে কি?" আমি তাড়াতড়ি বাহির হইয়া আসিলে বলিলেন—"তুমি ওর জন্যে ভেব না। আমি ভেবে দেখ্‌লুম, স্প্নার সাহেবকে বুঝিয়ে বল্লে, সে নিশ্চয় কোন গোল করিবে না; এমন কি, যদি কৌটাটা খুলি, তা হলেও বোধ হয়, বিশেষ আপত্তি করবে না; শেষকালে জিনিষটা ফিরিয়ে দিলেই চুকে যাবে।" আমি বুঝিলাম, ভদ্রলোকের কৌটা খুলিবার আগ্রহ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়াছে।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে চা খাইতেছি, এমন সময় গঙ্গাধর বাবু আসিয়া বলিলেন—"নরেন, আমি আর একবার এসেছিলুম, দেখি তুমি ঘুমুচ্ছ। কৌটাটাকে অনেক কষ্টে খুলেছি, তার ভিতর থেকে একটা স্ফটিকের ডিমের মত পাত্র বেরিয়েছে; দেখ্‌বে চল।"

আমি লাফাইয়া উঠিয়া, তাঁহার সহিত চলিলাম; তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাল সমস্ত রাত কৌটাটা নিয়ে খেটেছি। সেটাকে পরিষ্কারও করেছি, তার গায়ে লেখা বেরিয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় জিনিষটার এক জায়গায় একেবারে ভেঙ্গে গেছে। মর্‌চে ধ'রে এক এক জায়গায় একেবারে খ'য়ে চূর্ণ হ'য়ে গেছে কিনা!"

তাঁহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইলে, তিনি দেরাজের মধ্য হইতে, কাচের paper-weightএর মত একটা জিনিষ সন্তর্পণে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া, বলিলেন—"এটা ফাঁপা, hermetically seal করা। ভিতরে, করাতের গুঁড়ার মত, কি রয়েছে দেখেছ; ওর সম্বন্ধে কৌটার গায়ে যে inscription আছে—সে অতি অদ্ভুত কথা—নিতান্ত অসম্ভব কথা; কিন্তু—"

ইতিমধ্যে, স্ফটিক পাত্রটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, টেবিল হইতে তুলিয়া লইলাম; কিন্তু গঙ্গাধর বাবুর কথার প্রতি মন

থাকাতে অসাবধানতায় উহা হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া চূরমার হইয়া গেল!

"যাঃ সর্ব্বনাশ!—করলে কি?" বলিয়া গঙ্গাধর বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি লজ্জায় ও ক্ষোভে একেবারে 'এতটুকু' হইয়া গেলাম! গঙ্গাধর বাবু, আর বাক্যব্যয় না করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে করাতের গুঁড়ার ন্যায় পদার্থটি মেঝে হইতে সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সৌভাগ্যক্রমে, মেঝে সিমেণ্ট করা বলিয়া, গুঁড়ার অধিকাংশই পাওয়া গেল। তিনি, একটা শিশির মধ্যে উহা পূরিয়া, দেরাজে চাবি-বন্ধ করিলেন।

পরে, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাক্, It is no use crying over spilt milk মনে করেছিলুম, এর সম্বন্ধে একটা paper (প্রবন্ধ) লিখে, 'এসিয়াটিক সোসাইটি'তে পাঠাব; তা আর হ'ল না! এখন আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে পারব না। কৌটোটাও ভেঙ্গেছে এটাও গেল; এখন রইল খালি গুঁড়োটা;—তা থেকে যদি নূতন কিছু পাওয়া যায়।"

অতি দুঃখেও, কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি যে বলছিলেন, গুঁড়োটার বিষয়ে কৌটোর গায়ে কি লেখা আছে;—সেটা কি?"

গঙ্গাধর বাবু।—হাঁ। কৌটোটার আষ্টেপিষ্টে ঐ কথা খোদাই

করা ; কিন্তু মরচে ধরে এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পড়া দুষ্কর—কতক জায়গায় লেখা একেবারে মুছে গেছে, Magnifying glass দিয়ে মোটামুটি একরকম পড়্‌তে পেরেছি। যতখানি পড়্‌তে পেরেছি, তার একটা translation (অনুবাদ) ক'রে রেখেছি এই দেখ।" ব্লটিং-প্যাডের নীচে থেকে একখানা কাগজ বাহির করিয়া, তিনি আমার হাতে দিলেন ; তা'তে এই লেখা—

"ওঁ নমঃ মহাকালায়॥ ধ্বংসপ্রাপ্ত মহানগরীরূপ মহাশ্মশানে * * * ব্যাপী সাধনাদ্বারা ব্রহ্মচারী বজ্রাচার্য্য কালের প্রভাব-বিনষ্টকারী নবযৌবন-প্রদায়ক দিব্যতেজঃসম্পন্ন রসায়ন * * * * মাষাপ্রমাণ চতুর্থী ও একাদশী তিথিতে সেবন * * * * ক্রমশঃ বয়স-অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে * * * * * শ্রীমন্মহারাজ * * দিত্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন এবং বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রমে মানবের মহা অশুভ * * * * * বিনষ্ট করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া স্ফটিকভাণ্ডে রক্ষা করিয়া বেদিগর্ভে প্রোথিত করিলাম।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য ! এ স্বপ্ন দেখ্‌ছি না তো ?"

গঙ্গাধর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি লেখাটা ধ্রুব সত্য ঠিক ক'রে বস্‌লে ? ঐ তো আমাদের দোষ! শিক্ষিত লোকেরাও সত্যমিথ্যা বিচার কর্‌বার চেষ্টা করে না।

আমাদের দেশে আগে ওষুধের গুণ সম্বন্ধে কি রকম অত্যুক্তি করত, তা জাননা কি? এই যেমন শ্রীগোপাল তেল মাখ্‌লে ভূত-প্রেত দানাদৈত্য সব পালিয়ে যায়। অত্যুক্তি বাদ দিয়ে বুঝ্‌তে হ'বে, এই রসায়নটা একটা tonic ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হ'ক, এর সত্যমিথ্যা হাতে কলমেই জানা যাবে।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এই গুঁড়োটা খাবেন নাকি?

গঙ্গাধর বাবু,—"কেন, তা'তে আর হ'য়েছে কি? এটাতো সাধারণ tonic ছাড়া আর কিছু নয়; তা ছাড়া, এই হাজার বছরে কি আর ওতে কিছু পদার্থ আছে? আমি নিঃসঙ্কোচে সব গুঁড়োটা খেয়ে ফেল্‌তে পারি।"

আমি শঙ্কিত হইয়া বলিলাম, "না—না—ওরকম কাজ করবেন না,—কি করতে কি হবে! জ্যাঠাই মা শুনতে পেলে, ভেবে অস্থির হবেন।"

অপ্রসন্ন মুখে গঙ্গাধর বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আপাততঃ না হয় থাক্; এর পর দেখা যাবে।"

৬

বসন্তের হাওয়া দিয়াছে, গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরেও একটা সজীব ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে—রক্তে যেন একটা

মাদকতার সঞ্চার হইয়াছে ও সকলের চালচলনে একটা অকারণ স্ফূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মধুঋতু গঙ্গাধর বাবুকেও স্পর্শ করিয়াছে দেখিতেছি। প্রায়ই দেখিতে পাই—তিনি আপনার মনে গুন্‌গুন্ স্বরে গান করেন, কখনও বা অন্যমনস্কভাবে গলা ছাড়িয়া তান ধরেন। কর্কশ গলায় সুরলেশহীন সে তান শুনিলে খাইতে খাইতে বালি চিবাইলে যেরূপ সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে, দেহে সেইরূপ অনুভব হয়। চিরকালই আহার সম্বন্ধে তাঁহার অনাস্থা, সেজন্য তাঁহার স্ত্রী প্রায় অনুযোগ করিতেন; কিন্তু আজকাল বেশ খাইতে পারেন, প্রায় অন্নব্যঞ্জন চাহিয়া লন, এমন কি কখনও এটা সেটা রাঁধিতে ফরমাস্ করেন। শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি আর পূর্ব্বের মত উদাসীন নহেন—প্রত্যূষে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হ'ন, অধিক কি বৈকালে দশ-পনর মিনিট স্যাণ্ডোর নিয়মানুসারে ব্যায়াম করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তাঁহার স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই।

একদিন দেখি, কলেজে বাহির হইবার সময় চাকরকে ভর্ৎসনা করিতেছেন—কেন সে তাঁহার সাদা প্যাণ্টলুনের নানাস্থানে হলুদমাখা হাতের ছাপ লাগাইয়াছে এবং শার্টের 'কফে', বোতামের পরিবর্ত্তে পাটের সূতালি দ্বারা বাঁধিয়াছে! তিরস্কারে অনভ্যস্ত চাকর বিরক্ত ভাবে যখন বুঝাইতে চাহিল যে, পোষাক-পরিচ্ছদে হলুদ লাগাইতে নাই—এ কথা তাহাকে গত দশবৎসরের মধ্যে কেহ

বলে নাই এবং তিন মাস পূর্ব্বে বোতাম হারাইয়া যাওয়ার এপর্য্যন্ত সূতাদ্বারাই শার্টের হাতা বাঁধা হইতেছে, তখন গঙ্গাধর বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন যে পুনর্ব্বার এরূপ করিলে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। পত্নীর বহু অনুরোধসত্ত্বেও যাঁহার বেশভূষা সম্বন্ধে চরম শৈথিল্য ছিল, তাঁহার পরিচ্ছন্নতার প্রতি এই নব-অনুরাগ দেখিয়া, আমি বড়ই প্রীত হইলাম। যাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, চাকরবাকর অপরাধ করিলে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, তাঁহাকে ভৃত্যশাসন করিতে দেখিয়া ভাবিলাম যে, স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার মানসিক দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইতেছে।

ইহার পর একদিন তিনি বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া রাত্রে আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ফিরিলেন না। তাঁহার স্ত্রী একবার বাহিরে একবার ভিতরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন এগারটা বাজিয়া গেল, তখন আর উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে বলিলেন, "বাবা নরেন, একবার বেরিয়ে দেখতে পার—তিনি কোথায় গেলেন? যে মানুষ আজ দশ বছরের মধ্যে কখনও রাত্রি আটটার পর বাইরে থাকেন নি, তিনি যে শুধু শুধু এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরবেন না, এ হইতেই পারে না! আমার ভয় হচ্ছে, হয়তো কি বিপদ-আপদ হয়েছে।"

কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া আমি বাহির হইলাম; কিন্তু

কোন্ দিকে খুঁজিতে যাইব বুঝিতে না পারিয়া মোড়ের নিকট দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় দেখি একখানা একায় চড়িয়া গঙ্গাধর বাবু আসিতেছেন। তাঁহাকে একায় দেখিয়া আমার মনে হইল, নিশ্চয়ই একটা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া সে রকম কিছু মনে হইল না। আমাকে দেখিয়া সেখানেই একা হইতে নামিলেন, এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে?" আমি কারণ বলিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন—আমি কি খোকা নাকি, যে ছেলে-ধরায় ধ'রে নিয়ে যাবে" !

পরে, গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "আসল কথা কি জান—আমার স্ত্রী একদণ্ড আমাকে ছেড়ে থাকৃতে পারে না, আর আমারও সেই দশা! আমরা দুটিতে কপোত-কপোতীর মত, সর্ব্বদা মুখোমুখি হ'য়ে থাকলেই সুখী থাকি ; আচ্ছা বল দেখি, আমার স্ত্রীর মত মুখের চটক্ আর কারো দেখেছ? কাল রাত্রে, দেখে দেখে আমার আর আশ মিটছিল না।—

'জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।'

পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ ও গঙ্গাধর বাবুর মত গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেলাম।

কি বলিব বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, "এক্কার ভাড়াটা চুকিয়ে দিলে হয় না ?"

তিনি এক্কাওয়ালাকে পয়সা দিলেন ; কিন্তু সে ভাড়া কম হইল বলিয়া গোল করিতে লাগিল। কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল ; কিন্তু এখন তাঁহার কি মতি হইল, দুইটা পয়সা বেশি দিতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। উপরন্তু, দুই এক কথায় একেবারে সপ্তমে চড়িয়া, "হারামজাদ, তুম্‌কো হাম্ খুন করেঙ্গে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া এক্কাওয়ালাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। আমি না থাকিলে একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেন, সন্দেহ নাই। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলাম—"একি ? এই নিরীহ গোবেচারি মানুষ—তার আজ এ কি কাণ্ড ?"

সকাল বেলা তাঁহার সহিত দেখা হইলে তিনি মহা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কাল রাত্রে কোথা গিয়েছিলুম জান ? বেড়িয়ে মাঠের ধার দিয়ে ফিরছি, দেখি মাঠে পার্সি থিয়েটারের তাঁবু। টিকিট্ কিনে ঢুকে পড়্‌লুম। ওরা বেশ প্লে করে হে, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গিয়েছে।" বলিয়া গান ধরিলেন—"সাড়ে তিন পয়সা এক মছ্‌লি নেহি বেচোঙ্গে।"

আমি তো অবাক্। যত হিন্দুস্থানীদের সহিত একত্র বসিয়া ঐরূপ অপদার্থ থিয়েটার দেখিতে তাঁহার রুচি হইতে পারে, তাহা

আমার ধারণাই ছিল না ; তাহার উপর আবার ঐরূপ গান ! পরে ভাবিলাম—হইতেও পারে, বড়লোকদের যেমন মুড়ি খাইবার সখ, ইঁহারও এক্কা-চড়া ও পার্সি থিয়েটার দেখাও হয় তো সেইরূপ। কিন্তু তাঁহার গত রাত্রের রসিকতা, এক্কাওয়ালার সহিত ব্যবহার, থিয়েটারেরই অপদার্থ গান-আবৃত্তি করা, ইত্যাদিতে কেমন কেমন মনে হইতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রীরও বোধ হয় মনে একটা খট্‌কা জন্মিয়াছিল ; কারণ, সময়ে সময়ে দেখিতাম, তিনি অলক্ষ্যে স্বামীর দিকে উৎকণ্ঠিত নেত্রে চাহিয়া আছেন।

কিছুদিন যায়।—গঙ্গাধর বাবুর চালচলন ক্রমেই কেমন বিসদৃশ হইয়া যাইতেছে। দুই এক দিন দেখিলাম, শরীর অসুস্থ বলিয়া, কালেজে গেলেন না ; কিন্তু আমি আপিস হইতে ফিরিয়া শুনিলাম যে, তিনি বেলা দুইটার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। রবিবারের দিন কিন্তু মোটেই বাহির হইলেন না, অথচ বাড়ীতে বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। একদিন বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় কাদা হওয়ায় একটা নূতন পথ দিয়া আফিস হইতে ফিরিতেছি— বেলা তখন প্রায় ৪৷৷৹টা—দেখি, গঙ্গাধর বাবু মাঠের ধারে ফিটজিরম্ রোডের মোড়ের নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া প্রথমে থতমত খাইয়া গেলেন ; পরে কষ্টহাস্যের

সহিত বলিয়া উঠিলেন—"কি, আজ যে বড় তাড়াতাড়ি আফিস থেকে ফিরেছ ? আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, আমার সঙ্গে চল না, একেবারে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরবে এখন। ওই দিকে চল।" বলিয়া একরকম জোর করিয়াই আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন ; আমার মনে একটু সন্দেহ হইলেও, ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

তাহার পরদিনেই সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেল। বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দরজায় একখানা গাড়ি আসিয়া লাগিল ; গাড়ি হইতে জুতা-মোজাপরা একজন স্থূলকায় প্রৌঢ়া মহিলা নামিয়া, আমার দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া, তাঁহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"আমি, একবার গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর স্বামীর ব্যবহারের কথা বল্‌তে চাই। একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক—কলেজের প্রোফেসার—বয়স হয়েছে—তাঁর এই রকম কাণ্ড! আপনাকেই সব কথা বলি—এখানকার * * বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম জানেন তো ; ওই মিউজিয়ম রোডের ধারে, আমি সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। স্কুলে একটি মেয়ে পড়ে, বড় ভাল শান্ত মেয়ে, বয়স মোটে ১২।১৩ বছর—তাকে গঙ্গাধর বাবু এমন বিরক্ত ক'রে তুলেছেন যে, বল্‌বার কথা নয়। টিফিনের ছুটির সময়, স্কুলের রেলিংএর কাছে

দাঁড়িয়ে, মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন; তাকে দেখে হাসেন, ছুটির সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন, তার পিছনে পিছনে যান; সে বেচারি তো ভয়ে আধমরা হয়ে উঠেছে। তার উপর, স্কুলের অন্য মেয়েদের ঠাট্টায় অস্থির হয়ে উঠেছে, স্কুলে আসতে কান্নাকাটি করে; অথচ ভয়ে এ পর্য্যন্ত কাউকে কোন কথা বলতে পারে নি। বলুন দেখি, একথা যদি প্রকাশ হয়, তা হ'লে তার বাপ-মা কি বলবে! আর আমার স্কুলের কি রকম বদনাম হবে? এর একটা বিহিত ক'রে তবে আমি যাব।

আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি প্রকৃতিস্থা হইলে ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "আপনার নিশ্চয় ভুল হয়েছে। গঙ্গাধর বাবু এমন কাজ কখনও করতে পারেন না।"

শিক্ষায়িত্রী। "আমি ভাল ক'রে না জেনে কি সাহস ক'রে এমন কথা আপনাদের বাড়ীতে এসে বলছি? গঙ্গাধর বাবু কাল স্কুলের ঝিকে একটা টাকা দিয়ে মেয়েটিকে একখানা চিঠি আর একটা গোলাপ ফুল দিতে দিয়েছিলেন। এই দেখুন সেই চিঠি। গঙ্গাধর বাবুর হাতের লেখা চেনেন্ তো?"

দেখিলাম গঙ্গাধর বাবুরই হস্তাক্ষর বটে! কিরণ নাম্নী কোন নায়িকার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রেম-কবিতা, তাহার দুইটি ছত্র মনে আছে:—

উড়াইয়া এলোচুল কর ছুটাছুটি,
ইচ্ছা করে পায়ে প'ড়ে খাই লুটোপুটি।"

ছি—ছি—ছি! বুড়া বয়সে একি কেলেঙ্কারি! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। যাই হউক, গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর কাণে একথা কখনই উঠিতে দিব না—স্থির করিয়া শিক্ষয়িত্রী মহাশয়াকে আশ্বস্ত করিলাম যে এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিবিধান করিব এবং গঙ্গাধর বাবু যাহাতে তাঁহাদের আর কখনও বিরক্ত না করেন সে ব্যবস্থা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। মহিলাটিকে ভাল বলিতে হইবে; তিনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

গঙ্গাধর বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। কি করিয়া একথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিব ভাবিয়া প্রথমটা চিন্তিত হইয়াছিলাম কিন্তু এ বিষয়ে লজ্জা করিলে চলিবে না বুঝিয়া দ্বিধা দূর করিলাম। তিনি আসিতেই তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশের কথা বলিলাম,—তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর, নিদ্রাভঙ্গে কোন অজানা স্থানে আসিয়াছে দেখিলে লোকে যে রকম দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখে, গঙ্গাধর বাবু সেই রকম ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—যেন তাঁহার কতকটা চেতনা হইল। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুস্বরে বলিলেন: "তাই ত: কাজটা ভাল হয়নি।"

তাহার পর আর এ বিষয়ে কোন গোলযোগ হয় নাই; তবে কলেজে একটা ঘটনা লইয়া হাঙ্গামা হইয়াছিল। ইদানীং তিনি ক্লাশে পড়ান না, কেবল ফষ্টি-নষ্টি করেন বলিয়া একটা কাণা-ঘুষা চলিতেছিল; কিন্তু, ছাত্রদের তাঁহাকে বরাবর ভয় ও ভক্তি করিয়া চলা অভ্যাস বলিয়া, কথাটা অধিকদূর গড়ায় নাই। ইহার উপর তিনি একদিন অধ্যাপকদের বসিবার ঘরে একখানা চেয়ারের পায়া ভাঙ্গিয়া রাখায় একজন অধ্যাপক পড়িয়া গিয়া আঘাত পান এবং অন্য একজনের চেয়ারে আলপিন্ গুঁজিয়া রাখায় তিনি চেয়ারে বসিয়াই বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শুনিলাম, তাঁহাদের আকস্মিক বিপদে উপস্থিত সকলেই—"কি হইল, কি হইল" করিয়া, শশব্যস্ত হইয়া উঠেন; কিন্তু গঙ্গাধর বাবু প্রায় পাঁচ মিনিট-ব্যাপী অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাতে স্বভাবতঃই অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং উত্ত্যক্ত অধ্যাপকদ্বয়, তাঁহার ব্যবহারে ব্যথিত ও অপমানিত হইয়া, প্রিন্সিপালের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই সময় গুজব উঠিল যে, কলেজের একজন বেহারা ১০॥টার পূর্ব্বে গঙ্গাধর বাবুকে চেয়ারের পায়া ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে। ইহা লইয়া কলেজে বিষম হুলস্থূল উপস্থিত হইল; কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব, গঙ্গাধর বাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া, তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে

মাথা-খারাপ হইয়াছে বলিয়া, প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁহাকে তিন মাসের ছুটি লওয়াইলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ হইল তাঁহার স্ত্রী, বৃথা হা-হুতাশ না করিয়া অক্লান্ত সেবায় নিজের শরীর-মন উৎসর্গ করিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না।

গ্রীষ্মের ছুটি হইলে, গঙ্গাধর বাবুর দশ বৎসরবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মল বাঁকিপুরে বেড়াইতে আসিল। আমি তাহাকে ষ্টেশন হইতে আনিতে গেলাম ও ষ্টেশন হইতে আসিতে আসিতে কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, সে জ্যাঠাইমাকে নিজের মার অপেক্ষা ভালবাসে কিন্তু জ্যাঠা-মহাশয়কে যমের মত ভয় করে, তাঁহাকে লুকাইয়া বেড়ায়।

সেই দিন মধ্যাহ্নে নির্ম্মল তাহার জ্যাঠাইমার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছে এমন সময় গঙ্গাধর বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন। অমনি নির্ম্মলের কথার স্রোতও বন্ধ হইয়া গেল, সে পলাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই—'ওরে—নির্ম্মল এসেছিস্ যে রে! চ, বেড়াতে যাই"—বলিয়া গঙ্গাধর বাবু তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন; সে নবমীর পাঁঠার ন্যায় কাঁপতে কাঁপিতে তাঁহার সঙ্গে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে দুইজনে ধূলি-ধূসরিত হইয়া, কলরব করিতে করিতে ফিরিলেন; গঙ্গাধর বাবুর বগলে ব্যাট্ ও উইকেট্, হাতে একটা লাটাই ও পকেট বিষম ভারি—নির্ম্মলের হাতে খান পাঁচ-ছয় ঘুঁড়ি। ফিরিয়া আসিয়াই গঙ্গাধর বাবু নির্ম্মলকে লইয়া—বাড়ীর সম্মুখে একটু পতিত জমি আছে, সেই খানে—সেই চৈত্র মাসের দারুণ রৌদ্রে, ক্রিকেট্ খেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; নির্ম্মল 'আউট হইয়া গেলে. দুই হাত তুলিয়া তাঁহার নৃত্যের ধূম দেখে কে!—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! পরে মার্ব্বেল-খেলা সুরু হইল; গঙ্গাধর বাবু ভূলুণ্ঠিত শ্মশ্রু লইয়া, উবু হইয়া বসিয়া, নির্ম্মলের সহিত সমান উৎসাহে, "গাবু" "নট কিচ্ছু" ইত্যাদি চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন নির্ম্মল, তাঁহাকে বারবার পরাজিত করিয়া গোটাকতক মার্ব্বেল জিতিয়া লইল—তখন তিনি, অভিমানভরে হাতের সমস্ত মার্ব্বেলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। বাড়ীর মধ্যে যাইয়া কি করেন, দেখিবার জন্য ভিতরে যাইয়া দেখি—গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রী, বাহিরের দিকের একটা জানালায় দাঁড়াইয়া সেই পতিত জমির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে! আমি নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময়, তাঁহার পড়িবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে

যাইতে দেখি, তিনি কতকগুলি মোটা মোটা বাঁধান বই লইয়া, এক এক জায়গা খুলিতেছেন,—তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল বলিতেছে, "না জ্যেঠামশাই, এখান্‌টা নয়।" আমি কুতূহলী হইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি, সেগুলি ডারুইন্‌, এমার্সন্‌, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি উচ্চ-অঙ্গের গ্রন্থ। প্রথমে ভাবিলাম—এই সকল গ্রন্থ কি নির্ম্মলকে পড়িতে বলিতেছেন! কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, তিনি গ্রন্থগুলিতে 'জলছবি' লাগাইতেছেন! কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ছবি লাগাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে নির্ম্মল মত প্রকাশ করিতেছে।

ইহার মধ্যে, একদিন নির্ম্মল আমাকে বলিল, "দেখুন্‌ নরেন্‌ দা! জ্যাঠামশাই যে এত ভাল হ'য়েছেন, তা আমি জান্‌তুম্‌ না; আমি আর কল্‌কাতায় যাব না, এই থানেই থাক্‌ব। তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গেলে যে মজা হয়, সে কি বল্‌ব। আজ বেড়াতে গিয়ে, আমরা দুজনে দু আনার চানা-চূর, দু আনার গোলাপী-রেউড়ি, আর পাঁচ আনার কচুরি গজা-টজা খেয়েছি। জ্যাঠাইমা বলেন যে জ্যাঠামশাই খেতে পারেন্‌ না—ও বাবা, আমার চেয়ে তিনগুণ খেতে পারেন! ঐ সব খাবার-টাবার খেয়ে, আবার একজনদের বাগানে পেয়ারা খেতে ঢুকেছিলেন; পেয়ারা গাছ থেকে এমন পড়ে গেছেন যে, ভুঁড়িটা ছ'ড়ে গেছে!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম সর্ব্বনাশ! ভদ্র-লোক আজ নিশ্চয় মারা যাইবে; ও রকম খাওয়া কি এ বয়সে

সহ্য হয়? সেইদিন রাত্রেই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইলেন পেটের যন্ত্রণায় এরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন যে ডাক্তারকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

এতদিনে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, আমার পাওয়া সেই গুঁড়াটা খাইয়া ইঁহার এই দশা ঘটিয়াছে! গুঁড়াটা তাঁহার শরীরে কোন পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়া তাঁহার মনকে প্রৌঢ়ত্ব হইতে যৌবনে, তাহার পর কৈশোরে এবং অধুনা বাল্যে উপনীত করিয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া সে কথা কহাকেও বলিতে পারিলাম না; কারণ, সেরূপ অসম্ভব কথা কেহ বিশ্বাস কবিবে না—উপরন্তু, একটা গুজবউঠিবে যে আমি কি খাওয়াইয়া ইঁহাকে পাগল করিয়া দিয়াছি—হয়ত গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর মনে চিরকালের জন্য একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, বড়ই অশান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

( ৯ )

এমন সময় কনিষ্ঠ-ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে, আমাকে সপ্তাহের জন্য একবার দেশে যাইতে হইল। এই বিপন্ন পরিবারকে ফেলিয়া যাইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না; কিন্তু না যাইলে

নয়, অগত্যা গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া ও ডাক্তার রাঘব বাবুকে প্রত্যহ দুই বেলা আসিতে অনুরোধ করিয়া দেশে রওনা হইলাম।

সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্বামীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি নীরবে মাথা নাড়িয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাশের ঘরে ছুটোপাটির শব্দ হইতেছিল। তিনি, মস্তক-সঞ্চালন দ্বারা সেই ঘর নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "খেলা করছেন।" ক্ষণেক পরে, সে ঘরের দরজা খুলিয়া, দাই অর্থাৎ ঝি লছমনিয়া, বাহির হইয়া আসিল; এক হাতে তাহার একটা আঙ্গুল ধরিয়া ও অন্য হাতের তর্জ্জনী নিজের মুখের মধ্যে পুরিয়া, চুষিতে চুষিতে গঙ্গাধর বাবু টলিতে টলিতে তাহার সঙ্গে বাহির হইলেন এবং আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি লছমনিয়ার পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! ব্যথিতকণ্ঠে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, "ওকি! নরেনকে দেখে লুকোচ্ছ কেন? ও দেশ থেকে এল, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা কর।" তখন তিনি সলজ্জভাবে, হাসিতে হাসিতে এক পা এক পা করিয়া, ঠিক দুই তিন বছরের শিশুর মত, আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, তাঁহার গালে এক ডেলা মিছরি—তাহার রসে হাত-মুখ দাড়ি চট্‌চট্‌ করিতেছে! আমি, তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য, মিষ্টভাষায় নানারূপ কথা

বলিতে লাগিলাম ; দেখিলাম, তাহাতে তিনি বেশ খুসী হইলেন, ও থলথল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।" আমি তাঁহার মৎলব বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি হঠাৎ আমার কোলে বসিয়া পড়িলেন। আমি এই অকস্মাৎ বিপদে এবং তাঁহার দেহের প্রায় তিন মণ ভারে, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে আমার কোল হইতে উঠাইয়া লইলেন। সেই দিন আমি ভাত খাইতেছি এমন সময় গঙ্গাধর বাবু হঠাৎ পিছন হইতে সবেগে আমার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এই অতর্কিত আক্রমণে এবং তাঁহার বিপুল দেহের ভারে আমি মুখ থুবড়িয়া ভাতের থালার উপর পড়িলাম, থালার কাণায় আমার কপাল কাটিয়া গেল, ডাল-ভাত তরকারিতে ছত্রাকার হইল। হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া আমি গঙ্গাধর বাবুকে মারিতে উদ্যত হইয়া পরক্ষণেই সামলাইয়া লইলাম। সৌভাগ্যক্রমে জ্যেঠাই মা সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না।

ইহার দুই তিন দিন পরেই, গঙ্গাধর বাবু হামা দিতে আরম্ভ করিলেন ; আর কথা বলিতে পারেন না,—ক্ষুধা পাইলে, তাঁহার জলদগম্ভীরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদেন—এমন পা ছুঁড়েন যে, তাঁহার নিকটে যাওয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠে ; আহ্লাদ হইলে,

হাততালি দিয়া "তা—তা—তা" শব্দ করেন। একজন হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ়বয়স্ক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির এইরূপ আচরণ, কাহারও কাহারও নিকট হাস্যজনক মনে হইতে পারে; কিন্তু চক্ষের উপর দেখিলে যে বুকফাটা কষ্ট হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে না। সংসারের তৈজস-পত্র রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিল; কারণ, চক্ষের অন্তরাল হইলেই তিনি হামা দিয়া গিয়া সকল জিনিষ ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া তছ্‌নছ্‌ করেন! একদিন দেখি, নিজের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় কতক-গুলি বই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া, দোয়াতের কালি চারিদিকে ছড়াইয়া ও নিজের হাতে মুখে মাখিয়া, বসিয়া আছেন! একটু অসাবধান হইলেই তিনি বারান্দা প্রভৃতি উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাত পান। একদিন একটা আস্ত সুপারি গলাধঃকরণ করিয়া দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া মারা যান আর কি!

এতদিনে সত্য সত্য অসহ্য হইয়া উঠিল। গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর যে অসাধারণ সহ্য গুণ, তাহাও বুঝি আর টিকে না। তিনি আর নিজেকে খাড়া রাখিতে পারেন না; মেঝের উপর পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, এক এক বেলা কাটাইয়া দেন।—আহারাদি তো একরকম বন্ধই করিয়া দিয়াছেন। আমি, সান্ত্বনা দিব কি, নিজেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি—মনে দারুণ অশান্তি।

ডাক্তারকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যা'ন।

এমন সময় সহসা ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একদিন রাত্রে, গঙ্গাধর বাবু হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। আমরা সভয়ে সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া কাটাইলাম। প্রত্যূষে গঙ্গাধর বাবু চক্ষু মেলিয়া, ক্ষীণস্বরে দুই একটি কথা বলিলেন ও ক্রমে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। যখন বুঝা গেল তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহার স্ত্রী আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—বাড়ীতে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। রহিল কেবল দুর্ব্বলতা, তাহাও অতি দ্রুত সারিয়া যাইতে লাগিল; দুইচারি দিনের মধ্যেই তিনি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহরে রাঘব ডাক্তারের জয়জয়কার পড়িয়া গেল এবং রাঘব ডাক্তার নিজে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে—"* * প্রণীত Record of Obscure Cases গ্রন্থেও এরূপ অদ্ভুত কেসের উল্লেখ নাই; বিলাতে কোন ডাক্তার এইরূপে রোগ আরাম করিলে, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।"

আমি সময় বুঝিয়া একদিন ব্রহ্মচারী-আবিষ্কৃত রসায়নের কথা তুলিলে, গঙ্গাধর বাবু বলিলেন—"সেটা খেয়েই তো আমার

জ্বরবস্তা হ'য়েছিল। কে জান্‌ত যে, দেহের উপর ওর কোন ফল হয় না কেবল মনের মধ্যে একটা Illusion আনে? Most infernal concoction! সাধ ক'রে মহারাজ আদিত্য কি ওটাকে পুঁতে ফেলতে হুকুম দিয়েছিলেন?"

গঙ্গাধর বাবু সেদিন আমার বিশ্বাস-প্রবণতার নিন্দা করিয়াছিলেন;—আজ তাহার জবাব দিবার দিন আসিয়াছে। আমি, বিজ্ঞতা-প্রকাশ করিবার লোভ-সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম, "যাই হ'ক ওষুধটার গুণ যে আশ্চর্য্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি সেই কথা বিশ্বাস করেছিলুম্ ব'লে আপনি সে দিন কত কথা বল্লেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পুরাকালে এমন এক একটা জিনিস ছিল, যা' আজকাল অসম্ভব ব'লে মনে হয়। আপনিই তো সেদিন বল্‌ছিলেন যে, প্রাচীন কালের এক একটা প্রকাণ্ড আস্ত পাথরের থাম দেখলে বোঝা যায় তখন পাথর কুঁদ্‌বার এত বড় যন্ত্র ছিল যে আজকাল সে রকম নেই; পাহাড় থেকে অনেক দূরে কোন কোন মন্দিরের গাঁথুনিতে এত বড় বড় পাথর আছে যে, সেগুলা কি ক'রে অত দূরে গিয়েছিল তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।' যারা এই সব করেছে, তারা যে অন্য অন্য বিষয়েও আজকালকার হিসাবে অসাধ্য-সাধন করেছিল তা নিশ্চয়; তবে, থাম-মন্দির ইত্যাদি স্থায়ী-জিনিস, তাই সেগুলো

আমরা চোখে দেখতে পাই; অন্য অন্য বিষয়ে যা ক'রেছিল, তা'র আর কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না! আমার তাই মনে হয় যে প্রাচীনকালের কোন ব্যাপার, আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হলেই, সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত নয়।"

গঙ্গাধর বাবু হাসিয়া বলিলেন—"Thou too Brutus!"

# মায়ার ডোর

কার্য্যোপলক্ষে বাঁকিপুর হইতে হাজারিবাগে আসিতেছিলাম, পথে এরূপ একটী অদ্ভুত ও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিলাম যে, হাজারিবাগে পৌছিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

হাজারিবাগ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ নগর ৪১ মাইল দূরে। এই ৪১ মাইল পথ পূর্ব্বে গরুর গাড়ি অথবা মনুষ্য-চালিত পুশ্‌পুশে যাইতে হইত। কিছুদিন হইল জনৈক সাহেব এক মোটর-কোম্পানি খুলিয়া যাত্রীদিগের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; পূর্ব্বের ২৪ ঘণ্টার পথ মোটরে চার ঘণ্টায় যাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের ডাকও এই মোটরে যায়।

ঘণ্টাকয়েক হাজারিবাগ-রোডে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে মোটর ছাড়ে, তাহাতে হাজারিবাগ যাত্রা করিতে যাইয়া দেখিলাম, মোটরখানি এক বিরাট দোতলা গাড়ী; একতলাটা বাক্সের মত; তাহার মধ্যে মাল যায়; তাহার উপরে সারিসারি বেঞ্চে ২৫।৩০ জন যাত্রী ঠেসাঠেসি বসিয়া আছে, আর তিলমাত্র স্থান নাই। আমি মুস্কিলে পড়িয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়

হ্যাটকোট-পরিহিত একটি বাঙ্গালী-যুবক আসিয়া নম্র ও ধীরভাবে বলিল, "জায়গা পাচ্ছেন না? আমি এই গাড়ির শকার ( চালক )। আমার সীটে যথেষ্ট জায়গা আছে, সেইখানে বস্‌বেন কি?" আমি দেখিলাম, মোটর-চালকের বেঞ্চটি বেশ প্রশস্ত; সেখানে বসিলে হাত-পা ছড়াইয়া আরামে যাওয়া যাইবে এবং চারিদিক দেখিতে পাওয়া যাইবে; উচ্চে অবস্থিত অন্যান্য যাত্রীদের সম্মুখে আবরণ থাকায় তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। মোটর-চালককে ধন্যবাদ দিয়া আমি তাহার বেঞ্চের একধারে বসিলাম। সে মধ্যে বসিল এবং তাহার অপরপার্শ্বে তাহার সহকারী একজন মুসলমান মিস্ত্রী বসিল।

কথাবার্ত্তা আচরণ ও চেহারায় মোটর-চালককে ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হওয়ায় এবং সে যত্ন করিয়া আমাকে স্থান দান করায়, আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। একটু পরেই তাহার সহৃদয়তার আর একটি পরিচয় পাইয়া আরও আকৃষ্ট হইলাম। গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক-জন মাড়োয়ারি, মুটের মাথায় প্রকাণ্ড দুইবস্তা কাপড় লইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। টিকিট-বিক্রেতা তাহার ভাড়া ও মালের মাশুলস্বরূপ চার টাকা চহিলে, সে তিন টাকার অধিক দিতে অস্বীকৃত হইয়া মহা বচসা বাধাইয়া দিল। বচসা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। গাড়ী ছাড়িতে

দেরি হওয়ায় যাত্রীরা মহা বিরক্ত হইয়া "উতার দেও," "পুলিসমে দেও" বলিয়া কলরব আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন দেখা গেল, যে মাড়োয়ারির নিকট তিনটির বেশী টাকা নাই, তখন মোটর-চালক টিকিট-বিক্রেতার নিকট আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ভাই ও টাকাটা ছেড়ে দাও, আমি তোমায় দেব। পারি যদি, পরে ওর কাছ থেকে নেব।" তখন গণ্ডগোল থামিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এই সকল কারণে মোটর-চালক বিশেষরূপে আমার লক্ষ্যীভূত হওয়ায় আমি দেখিলাম, তাহার মুখ-চোখ যেন বড়ই ম্রিয়মাণ ও বিষণ্ণ, কথা-বার্ত্তা ও ধরণ-ধারণ স্ফূর্ত্তিহীন।

মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া মোটর ছুটিতেছে। যাঁহারা এই মোটরে রাত্রিকালে যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সাধারণ মোটরের ন্যায় এই গাড়ীতে দুইটা ল্যাম্প নাই; গাড়ীর অন্য কোন স্থানেও আলো নাই; কেবল গাড়ীর সম্মুখে এঞ্জিনে দম দিবার যে হাতল আছে, তাহার নিকটে একটিমাত্র ল্যাম্প আছে। সেই ল্যাম্পটির আলোক পথের মধ্যস্থলে পড়ায় রাস্তার বাহিরে দুইধারে বড় কিছু দেখা যায় না, কিন্তু সম্মুখের রাস্তা সোজা হইলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অত্যন্ত অসমতল পার্ব্বত্য-দেশ বলিয়া রাস্তাটি অনেক স্থানে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মোটরের আলোকে সোজা রাস্তায় অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল;

কিন্তু যেখানে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে—দূর হইতে বোধ হইতেছিল, যেন সেইখানেই রাস্তা শেষ হইয়াছে। বাঁকের মুখে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ঘন-বৃক্ষশ্রেণীর উপর দূর হইতে আলো পড়ায় বোধ হইতেছিল, যেন রাস্তার উপর দিয়া একটা প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে; আর মোটর যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে প্রাচীরকে বৃক্ষশ্রেণী বলিয়া বুঝা যাইতেছিল; মনে হইতেছিল, এইবার বুঝি গাড়ীখানা সবেগে গাছগুলার উপর যাইয়া পড়িল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গাড়ীখানা ভোঁ করিয়া অন্যদিকে ফিরিলে বুঝা গেল, ওঃ! এটা একটা মোড়। এইরূপে প্রথম দুইএকবার বাঁকের নিকটবর্ত্তী হইলে একটু ভয় হইয়াছিল। তাহার পর ব্যাপারটা বুঝিলে মোটর-চালককে বলিলাম, "বাঁকের মুখে গাছগুলার উপর দূর থেকে আলো পড়ে কেমন দেখাচ্ছে, দেখেছেন?"

গাড়ীতে আলো না থাকিলেও আবছায়াতেই দেখিতে পাইলাম, আমার কথায় মোটর-চালক চমকিয়া উঠিল। গতি-নিয়ামক-যন্ত্রস্থিত তাহার হাত নড়িয়া উঠায় গাড়ী হঠাৎ রাস্তার একধারে যাইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি সামলাইয়া, গাড়ী থামাইয়া, সম্মুখে চাহিয়া বলিল, "কৈ, আমি ত কিছুই দেখ্‌ছি না?"

আমি তাহার ভাবগতিকে একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম,

"দেখ্‌বার মত কোন জিনিসের কথা ত আমি বলিনি; আমি বল্‌ছিলুম, বাঁকের মুখে গাছগুলোর উপর দূর থেকে আলো প'ড়ে, কেমন পাঁচিলের মত দেখাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে যেন গাড়ীখানা তার উপর গিয়ে পড়বে।" সে "ওঃ" বলিয়া আবার গাড়ী চালাইল; বোধ হইল, যেন তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

এইবার আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। পরিচয়ে জানিলাম, তাহার নাম রামলাল সরকার; বাড়ী বেলঘরিয়া; এক বৃদ্ধা মাতা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই।

কিছুপরে গাড়ী বগোদরে উপস্থিত হইল। পথে এই একটি মাত্র স্থানে গাড়ী থামাইয়া যাত্রী ও ডাক তুলিয়া লওয়া হয়। গাড়ী থামিতেই অনেক লোক লণ্ঠন হাতে করিয়া উপস্থিত হইল; কেহ আত্মীয়কে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, কেহ মাল লইতে আসিয়াছে, কেহ যাত্রী লইতে আসিয়াছে, কেহ চার-পাঁচজন ব্যক্তি রামলালকে হাজারিবাগ হইতে নানা জিনিস আনিতে ফরমাস করিল। কাহারও ডুইসের আলু চাই, কাহারও হারিকেন-লণ্ঠন চাই। একজন বাঙ্গালী দুইপয়সার পান ও একটা ছিটের কোট ফরমাস করিয়া, পানের পয়সা দিয়া বলিল যে কোটের দাম পরে দিবে। রামলাল অম্লান-বদনে সকলের ফরমাস প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

ইতিপূর্ব্বে অল্প-অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, আমি সমবেত লোকদের একজনকে তাহার হাতের আলোটা দেখাইতে অনুরোধ করিয়া, ব্যাগ খুলিয়া ওয়াটারপ্রুফটা বাহির করিয়া লইলাম। ব্যাগের মধ্যে থিয়সফিক্যাল-সোসাইটির একখানা রিপোর্ট ছিল। সেখানা তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া ব্যাগ বন্ধ করিতেছি, এমন সময় রামলাল সেখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "এখানা পড়ে রইল যে!" আমি তখন সেখানা ব্যাগে বন্ধ করিলাম। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, রামলাল ধীরে-ধীরে বলিল, "আপনি কি থিয়সফি-ক্যাল সোসাইটির মেম্বার?" আমি "হাঁ" বলিলে, সে কহিল, "আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে; সে সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি নিজে কিছুই জানি না, তা' প্রশ্নের উত্তর দেব কি? তবে ঘটনাটা শুনলে, যাঁদের এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে, তাঁদের জিজ্ঞাসা করে' আপনাকে জানাতে পারি।" রামলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, গলা ঝাড়িয়া তাহার কাহিনীটি বলিতে আরম্ভ করিল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে গাড়ী চালাইতে চালাইতে সম্মুখের আলোকিত রাস্তার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া অনুচ্চ গাঢ়-স্বরে ধীরে ধীরে রামলাল নিম্নলিখিত কাহিনীটি বর্ণনা করিল।

আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার শৈশবকালেই পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার অসময়ে ডাক পড়ায় তিনি আমাদের

জন্য বিশেষ কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। উপযুক্ত শাসনের অভাবে, আমি যত বড় হইতে লাগিলাম, তত উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিলাম; বুঝিবার বয়স হইলেও আমার স্বভাব শোধরাইল না। মা আমার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। যথাকালে বিবাহও হইয়া গেল; কিন্তু তাহাতেও আমার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

এইরূপে বিবাহিত জীবনের দুই বৎসর কাটিয়া গেলে, আমি একদিন মাতাল হইয়া সঙ্গীদের সহিত মারামারি করিয়া ফাটা মাথায়, রক্তাক্ত-দেহে অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ীতে আনীত হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই নানা অত্যাচারে শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছিল; সেদিন মদও অতিরিক্ত খাইয়া ছিলাম তাহার উপর মাথায় বিষম চোট লাগিয়াছিল; ফলে, আমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল। প্রায় পনের দিন বিকারগ্রস্ত অবস্থায় এবং তাহার পর সপ্তাহখানেক শয্যাগত থাকিয়া ক্রমে ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিলাম। মা তখন পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সহিত তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। আমার চৌদ্দ পনর বৎসরবয়স্কা স্ত্রী ছাড়া বাড়ীতে অন্য কেহ ছিল না। সেই বালিকা একাদিক্রমে একুশ-বাইশ দিন প্রাণপাত করিয়া আমার সেবা করিয়া আমাকে নীরোগ করিয়া তুলিল। বিকারের মধ্যে একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই দেখিতাম, কাহার ডাগর চক্ষু দুইটি আমার দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইত, আমি অনাদিকাল হইতে মহাশূন্যে

জড়বৎ পড়িয়া আছি ; বিশ্বে আর কিছু নাই, কেবল সেই অপলক চক্ষু দুইটি অনাদিকাল হইতে আমার দিকে চাহিয়া, আমার জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। যখন খেয়ালের ঝোঁকে অস্থির হইয়া উঠিতাম, তখন সেই স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটি দেখিলেই নিমেষে আমার উন্মত্ততা দূর হইয়া যাইত। যখন আমার জ্ঞান হইত, তখন দেখিতাম—পক্ষিণী যেমন শাবককে ডানা ঢাকা দিয়া রাখে, সেই বালিকা তেমনি নিজের সর্ব্বদেহমন দিয়া আমাকে অমঙ্গল হইতে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। সে সহজে আমাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না ; ঘরের মধ্যেই অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, এক চক্ষু আমার উপর রাখিয়া দেয় ; সংসারে অন্য কেহ নাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে আমাকে একা রাখিয়া যাইতে হয়,—সে সময়ে ক্ষণে-ক্ষণে দেখিয়া যায়, আমি কি করিতেছি। আমি ক্ষীণ-স্বরে একবার ডাকিলেই ছুটিয়া আসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, "কি হয়েছে? কেন ডাকছিলে?" পথ্য দিবার জন্য আমাকে ধরিয়া বসাইবার সময় আমার বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিত, বুক ধড়ফড় করিতেছে কি না।

অসুখের মধ্যে কখন জানি না, আমিও তাহার প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। যখন বড় দুর্ব্বল, হাত-পা নিজের বশে নাই, তখন বিছানায় পড়িয়া কেবলই

তাহাকে দেখিতে ভাল লাগিত। সে যতক্ষণ কাছে থাকিত, মন বড় প্রফুল্ল থাকিত; চলিয়া গেলে মনের মধ্যে অন্ধকার হইয়া যাইত। তাহার পর দেহমনে আর একটু বলাধান হইলে ভাবিতাম, "এ এত সুন্দর তা, আগে দেখি নাই কেন? মুখখানি কি মধুর, চোখ-দু'টী কি করুণামাখা, হাত দু'খানি কি নরম; আহা, এ কয়দিনে বড় রোগা হইয়া গিয়াছে, কত কষ্টই পাইয়াছে।"

তাহার কষ্টের কথা ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ একদিন নিজের আচরণের কথা মনে হইল; আমি এতদিন কি ভাবে চলিয়া আসিতেছি, তাহাকে একদিন একটা ভাল কথা বলি নাই, ইয়ারকিতে উন্মত্ত হইয়া ভবিষ্যতের কথা একদিন ভাবি নাই, কি কেলেঙ্কারি করিয়া মাথা কাটাইয়া আসিয়া ইহাকে কি বিপদে ফেলিয়াছিলাম, আর এই সামান্য বালিকা আমার পশুবৎ আচরণ ভুলিয়া গিয়া বুক দিয়া আমাকে কিরূপ শুশ্রূষা করিয়াছে। এক একটি করিয়া এই সকল কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ও লজ্জায় আমি অভিভূত হইলাম, আমার শতবৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা ধরিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম এখন হইতে ইহার উপযুক্ত স্বামী হইবার চেষ্টা করিব; যেমন করিয়া পারি, রোজগার করিয়া ইহার ও মাতাঠাকুরাণীর দুঃখ দূর করিব। এইরূপে আমার বালিকা স্ত্রী নিজগুণে আমাকে অসৎপথ

হইতে ফিরাইল। গ্রামের লোকের নিন্দা, হিতৈষীদের উপদেশ এবং—বলিতে লজ্জা করে,—মার অশ্রুজল এতদিনে যাহা করিতে পারে নাই, সেই ক্ষুদ্র বালিকা একটি কথা না বলিয়া, কোন উপদেশ না দিয়া, একবারও অনুযোগ বা অভিমান না করিয়া, নিজের সতীত্বের তেজে তাহাই সম্পন্ন করিল।

প্রতিজ্ঞা ত করিলাম। কিন্তু রোজগারের পথ কোথা, কি করিয়া রোজগার করিব, কাহার কাছে চাকরির জন্য যাইব, কি দেখিয়া লোকে আমাকে চাকরি দিবে, ইহাই মহা দুর্ভাবনার বিষয় হইল। পাছে স্বর্ণ কষ্ট পায়,—আমার স্ত্রীর নাম স্বর্ণ—এই জন্য আমার দুশ্চিন্তার কথা তাহাকে বলি নাই ; কিন্তু ব্যাপার বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। আমার সুবুদ্ধির জন্য আমাকে অজস্র আদর করিয়া সে ধরিয়া বসিল, কলিকাতায় যাইয়া কোন কর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে, টাকার ভাবনা কি ? তাহার বাবা তাহাকে যে দুইচারখানা গহনা দিয়াছেন, তাহা বিক্রয় করিলে আমার একবৎসরের সংস্থান হইবে। তাহার প্রস্তাবে রাগ করিলাম, তাহাকে তিরস্কার করিলাম ; অবশেষে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, সতীলক্ষ্মীকে আভরণহীনা করিলে আমার অমঙ্গল হইবে। কিন্তু সে কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিল না ; বলিল, আমি রোজগার না করিলে কিছুদিন পরে সংসার চালাইবার জন্য অলঙ্কার অথবা যে দুইদশ বিঘা জমি আছে, তাহা বিক্রয় করিতেই

হইবে। তাহার অপেক্ষা এখন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কোন কর্ম্মশিক্ষা করা উচিত নহে কি? তাহার যে এত বুদ্ধি আছে, অথবা পনেরবৎসর বয়স্কা বালিকার যে এত বুদ্ধি থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

তাহার অনন্ত ও হার বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় যাইয়া নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পাঁচজনের পরামর্শে কিল্‌বার্ণ কোম্পানীর কারখানায় মোটর-চালকের কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। বোধ হয় সতীলক্ষ্মীর আগ্রহই আমার শিক্ষনবিশী শেষ হইলেই হাজারিবাগের এই চাকরিটি পাইলাম। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে সম্ভবতঃ কলিকাতাতেই একটা চাকরি জুটিত; কিন্তু এই চাকরিটির মাহিনাও বেশী, সে সময়ে টাকারও বড় দরকার এবং কিছুদিন হইতে স্বর্ণ ম্যালেরিয়ায় বড় ভুগিতে-ছিল, হাজারিবাগের জলবায়ুতে তাহার উপকার হইবে, এই সকল ভাবিয়া আহ্লাদের সহিত এই চাকরিটি গ্রহণ করিলাম। আমার চাকরি হওয়ায় মার আনন্দের সীমা রহিল না; আর স্বর্ণ হরিরলুঠ দিয়া সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর সমারোহে পূজা দিয়া, আমাকে দেউলিয়া করিবার উপক্রম করিল। স্থির করিলাম, হাজারিবাগে মাসখানেক থাকিয়া, একটা বাসা ঠিক করিয়া, মাতাঠাকুরাণী ও স্বর্ণকে এখানে লইয়া আসিব।

যথাসময়ে বাসা ঠিক করিয়া, মাতাঠাকুরাণীকে এখানে

আসিবার জন্য আমায় প্রস্তুত হইয়া খবর দিতে চিঠি লিখিলাম। কিন্তু চিরকালের ভিটা ছাড়িয়া, গরু ও যৎকিঞ্চিৎ জমিজমা যাহা ছিল তাহার বিলি করিয়া আসা সহজ নহে; সুতরাং একমাসের স্থলে দুই মাস বিলম্ব হইয়া গেল। অবশেষে মার অনুমতি পাইয়া তাহাদের আনিতে যাইয়া দেখি স্বর্ণর খুবই অসুখ,—প্রায় শয্যাগত; কিন্তু আমাকে দেখিয়া, আমার সহিত আসিবে বলিয়া, আনন্দ ও উৎসাহের আতিশয্যে কষ্টে উঠিয়া, এটা-সেটা গোছাইতে লাগিল, আমাদের নিষেধ শুনিল না। আমাকে আড়ালে পাইলেই বারবার বলিত, "দেখ, এইবার আমি ভাল হয়ে উঠ্‌ব।"

এখানে আসিয়া জল ও বায়ুর গুণেই হউক, অথবা তাহার স্ফূর্তি ও আনন্দের জন্যই হউক, প্রথম দিন-কতক তাহার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি দেখা গেল। আমি ভাবিলাম, এতদিন পরে আমরা সুখের মুখ দেখিলাম : ইহার বেশী সুখ বা ঐশ্বর্য্য চাই না।

দশ-বার দিন পরেই কিন্তু স্বর্ণ প্রবল জ্বরে পড়িল। দুই দিন প্রায় বেহুঁস হইয়া রহিল। আমি সাহেবকে অনুনয় বিনয় করিয়া ছুটি লইয়া, সেই দুই দিন দিনরাত্রি তাহার শুশ্রূষা করিলাম। তৃতীয় দিনে জ্বরটা ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল। ডাক্তারকে খবর দিলে তিনি বলিলেন, আর-কিছু করিতে হইবে না, ম্যালেরিয়া-জ্বর মধ্যে মধ্যে ঐরূপ প্রবলভাবে দেখা দেয়। সেদিন

রাত্রে আমার ডাক-মোটর চালাইয়া হাজারিবাগ-রোডে যাইবার পালা ; কিন্তু স্বর্ণের জ্বর বিকাল পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে কমিতে দেখিয়াও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছিল না। তাহা ছাড়া, দুইদিনের রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা ও উপবাসে আমার মাথা টলমল করিতেছিল এবং শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল ; চল্লিশ মাইল মোটর চালাইয়া যাইবার সামর্থ্য ছিল না। অতএব বেলা ৪টার সময় সাহেবের নিকট যাইয়া সে দিনের মত ছুটি প্রার্থনা করিলাম।

সাহেব একেবারে গরম হইয়া বলিলেন "আজ কিছুতেই ছুটী দেওয়া যেতে পারে না। তুমি দিনকতক আগে পরিবার আনতে চারদিনের ছুটী নিয়েছ, তার পর এই দুইদিন কামাই করলে; রোজ-রোজ এ রকম চল্‌তে পারে না। যাও, শীঘ্র তৈরি হয়ে এস, আজ ঠিক সময়ে গাড়ী ছাড়্‌তে হবে।" সাহেবকে অনেক বুঝাইলাম, নিজের অবসন্ন অবস্থার কথা বলিলাম, কিন্তু সাহেব কিছুতেই ছুটি দিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে বলিলেন, "আমি আর কোন কথা শুন্‌তে চাহি না ; আজ যদি না আসতে পার, তা' হ'লে কাল থেকে তোমাকে আর মোটেই আস্‌তে হবে না, তোমার চাকরি থাকবে না।"

সাহেবের বিশেষ দোষ ছিল না। একজন মোটরচালক অনুপস্থিত হইলে আর একজনের উপর ডবল কাজ পড়ে। তাহার উপর, সে সময়টায় অতিরিক্ত বর্ষা পড়িয়া

রাস্তার স্থানে স্থানে অনেকদূর পর্য্যন্ত খারাপ হইয়া যাওয়ায়, পাথরের টুকরা বিছাইয়া সে সকল স্থান মেরামত হইতেছে, ও সেই কারণে আমাদের ডাকমোটর উপর্য্যুপরি কয়েকদিন হাজারিবাগ-রোডে ট্রেন মিস্ করায়, প্যাসেঞ্জারদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে এবং বাঁকিপুর হইতে ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বার বার আমাদের কোম্পানিকে তাড়না করিয়াছেন। ঘন ঘন ট্রেন মিস্ করার ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য ডাকবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বাঁকিপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি সেই রাত্রের ডাক-মোটরে হাজারিবাগ হইতে ফিরিবেন; সুতরাং সেই দিন ট্রেন মিস্ করিলেই ব্যাপার গুরুতর হইবে। তাই আমাদের সাহেব স্বয়ং সেইদিন গাড়ীতে যাইবেন এবং আমি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও বেশী-মাহিনার চালক বলিয়া আমাকেই সেই গাড়ী চালাইবার জন্য জিদ করিয়া হুকুম দিলেন।

বিফল মনোরথ হইয়া আমি বিষণ্ণমনে বাসায় ফিরিলাম। তখন বেলা প্রায় ৬টা, আর একঘণ্টা পরেই ডাক-মোটর ছাড়িবে। আমি স্বর্ণের নিকট যাইয়া দেখি, সে চোখ বুঁজিয়া শুইয়া আছে; ভাবে বোধ হইল সে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে, আমি সন্তর্পণে তাহার কাছে বসিতেই সে চক্ষু চাহিল এবং ঈষৎ ম্লানহাসি হাসিয়া ভাঙ্গা গলায় ধীরে-ধীরে "এসেছ? আমার কাছে একটু বস" বলিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিল।

আমি তাহার শীর্ণ গাল দুটি দুই হাতে ধরিয়া বলিলাম "সোণা, আজ আর ছুটি পেলুম না, আমাকে এখনই ডাকগাড়ী নিয়ে যেতে হবে। কাল সকালে ফিরে আমি সমস্তদিন তোমার কাছে বসে থাক্‌ব, কেমন ?"

সে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আবার চক্ষু মুদিত করিল। তাহার দুই চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কম্পিত হস্তে আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে নিজের মুখে বুলাইয়া বলিল, "আঃ"।

কি জানি কেন, আমার চোখ-ফাটিয়া জল আসিল। দুই-এক ফোঁটা তাহার গায়ে পড়াতে স্বর্ণ চক্ষু চাহিয়া সেই ভাঙ্গা গলায় থামিয়া থামিয়া বলিল "কেন কষ্ট পাচ্ছ ? আমার একা একা মনে হবে না। আমার মন যে তোমার সঙ্গে যায়, তুমি গাড়ী চালাচ্ছ আমি দেখ্‌তে পাই।"

এই কয়টি কথা বলিয়াই সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমি তাহাকে বুকে করিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম, এবং কিছুক্ষণ পরে, সে সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় সে আবার বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব, তুমি মনে কষ্ট করো না।"

তাহার এই কথাটিতে আমার বুকের ভিতর উথলিয়া উঠিতে

লাগিল; কেবলই মনে হইতে লাগিল, উহার এই কাহিল অবস্থা, চোখ চাহিতে কষ্ট হইতেছে, হয় ত শরীরের মধ্যে কত যন্ত্রণা হইতেছে; এ অবস্থাতেও উহার প্রাণ আমার দিকে পড়িয়া আছে। আমার নিদ্রাজড়িত, অবসন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে স্বর্ণের এই কথাটি কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং একটা উগ্র-বেদনা বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

মনে দারুণ অশান্তি লইয়া আমাদের মোটরের আড্ডায় গেলাম; তখন আমার মুখচোখের ভাব দেখিয়া আমার মনিবের বোধ হয় একটু দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "বাবু, তোমার শরীর সত্যসত্যই খারাপ দেখিতেছি; কিন্তু আজ তোমাকে ছেড়ে দেবার উপায় নেই। দেখ, খুব হুঁসিয়ার হয়ে গাড়ী-চালাবে, আজ ট্রেন ধরাই চাই।" আমি গাড়ী ছাড়িয়া দিলে আমার সহকারী আবদুল মিস্ত্রী চুপিচুপি বলিল "বাবু, আপনাকে বড় হায়রাণ দেখছি। আজ আর আপনার গাড়ী চালিয়ে দরকার নেই; আমি চালাই, আপনি বসে থাকুন। সাহেব ভিতর থেকে দেখতে পাবে না।" আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তিন দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বলিতেছে এরূপ বর্ষা, তাহারা আর কখনও দেখে নাই। সে দিনও থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি

হইতেছে। ঘুমে আমার চোখ ভাঙ্গিয়া আসিতেছে; মাথার ভিতর গোলমাল হইয়া গিয়াছে, মন স্বর্গের কাছে পড়িয়া আছে, প্রাণপণ চেষ্টায় দেহমনকে বশে রাখিয়া গাড়ী চালাইতেছি। দুই ঘণ্টার উপর এই ভাবে চলিলে, হঠাৎ সম্মুখে বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড গাছগুলার উপর যেখানে গাড়ীর আলো পড়িয়াছে, সেইখানে নজর পড়ায় চমকিয়া উঠিয়া দেখিলাম,—কি ও! একবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবার ভাল করিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত যেন বুকের কাছে আসিয়া জমিয়া গেল, আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। দেখিলাম, সম্মুখের মোড়ের মুখে যে গাছের সারি রাস্তার উপর দিয়া গিয়াছে তাহার আলোকিত-অংশে একটি স্ত্রীলোকের প্রকাণ্ড ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! মুখচোখ দেখা না গেলেও, তাহার অবগুণ্ঠিত মস্তকের, বস্ত্রাবৃত ঊর্দ্ধ ও নিম্নদেহের এবং দেহের দুই দিকে ঋজুভাবে প্রসারিত অঞ্চলাবৃত দুই হস্তের সুস্পষ্ট ছায়া—ছায়ামূর্ত্তি যেন সম্মুখে দুইহাত বিস্তৃত করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইতে না হইতে, গাড়ী মোড় অতিক্রম করিয়া সোজা রাস্তায় পড়িল, গাড়ীর আলো কেবল রাস্তার উপরেই রহিল। আমি চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম; দুইপার্শ্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছপালা ও ঊর্দ্ধে ঘোর অন্ধকার ছাড়া

কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন ভাবিলাম, আমার চোখের ভ্রম; অথবা, হয় ত আমার অজ্ঞাতসারে তন্দ্রা আসিয়াছিল, তন্দ্রার বশে কি একটা দেখিয়াছি। ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া খাড়া হইয়া বসিলাম এবং অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে আবদুলের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ব্যাপারটাকে মন হইতে তাড়াইতে পারিলাম না। আর একটা মোড়ের নিকটবর্ত্তী হইলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মুখের আলোকিত গাছগুলার উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। আবার সেই ছায়ামূর্ত্তি! এবারে সেই মূর্ত্তি দুই প্রসারিত হস্ত ঘনঘন আন্দোলন করিয়া যেন বলিতেছে "আসিও না", অথবা "ফিরিয়া যাও।" বিদ্যুৎগতিতে স্বর্ণের কথা মনে পড়িল "আমি তোমার সঙ্গে থাকৃব।" কে যেন কাণের কাছে বজ্রনাদে বলিল, "স্বর্ণ নাই।" আমি প্রায় হতচেতন হইয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিলাম।

গাড়ী থামিতেই আবদুল আমাকে ঠেলিয়া বলিল, "বাবু, করেন কি? গাড়ী থামালেন কেন? এখনি সাহেব তেড়ে আস্‌বে।" আমি বলিলাম, "সামনে চেয়ে দেখ আবদুল, একজন মেয়েমানুষ হাত্‌নেড়ে আমাদের যেতে বারণ করছে।" ততক্ষণে ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। আবদুল কিছুই দেখিতে না পাইয়া বলিল, "কোথাও ত কিছুই নেই। এখানে দশক্রোশের ভিতর বসতি নেই, মেয়েমানুষ কোথা থেকে আস্‌বে? আপনার

মাথা খারাপ হয়েছে বাবু, সরে বসুন, আমি চালাই।" এমন সময় গাড়ীর মধ্য হইতে আমার সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "What's up, Babu? Why have you stopped?" আমি তখন তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। আমার মাথা ঘুরিতেছিল; দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, আমার স্বর্ণের মৃত্যু হইয়াছে। চাকার শব্দের তালে তালে আমার মাথার ভিতর কে যেন বলিতে লাগিল, "স্বর্ণ নাই, স্বর্ণ নাই, স্বর্ণ নাই!"

আবার একটা মোড়ের নিকটে আসিলে, চাহিয়া দেখিলাম,—আবার সেই মূর্ত্তি ঘনঘন হস্ত-সঞ্চালন করিতেছে। আবদুলাকে ডাকিতে গেলাম, কিন্তু প্রথমে কথা বাহির হইল না। অতি কষ্টে তাহাকে বলিলাম, "আবদুল, এইবার সামনের গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখ, একজন মেয়েমানুষের ছায়া হাতনেড়ে আমাদের যেতে বারণ করছে।" আবদুল বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই সজোরে আমার বাহু চাপিয়া ধরিয়া উঠিল, "আয় খোদা, আপ নে ঠিক কহা হায় বাবু। রোখিয়ে, গাড়ী রোখিয়ে।" আমি গাড়ী থামাইয়া সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিতে-দেখিতে ছায়া অন্তর্হিত হইয়া গেল; আবদুল ও আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এদিকে সাহেব লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "What the

devil is the matter with you? Why have you stopped again? You will surely miss the train." সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘরের সাহেব নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই রকম করিয়া তোমরা ট্রেন মিস্ কর, বটে? মিষ্টার—, আপনার মোটর-চালকটি নিতান্ত অকম্মণ্য দেখ্ছি। আমার বোধ হয়, আপনি কম মাহিনা দেন, তাই যত অকর্ম্মণ্য লোক আপনার জুটেছে।" এই কথায় আমাদের সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া আমার উপর অত্যন্ত তম্বি করিতে লাগিলেন। আমি কি বলিব, স্থির করিতে না পারিয়া বলিলাম, "সাহেব, কে একজন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থামতে সঙ্কেত করছিল।" সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এখানে কে থামতে বলবে? চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কোনও লোকালয় নাই।" কিন্তু যখন আবদুলও আমার কথায় সায় দিল, তখন "You must both be drunk; all right, we shall have a look" বলিয়া গাড়ি হইতে একটা হাঁরিকেন লণ্ঠন লইয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলেন।

কয়েকপদ যাইয়া বাঁকের মোড় ফিরিয়াই সাহেব, "O my God" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায় আমরা ছুটিয়া তাঁহার নিকট যাইতেই তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "Look, O look." আমরা স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম, ঠিক বাঁকের পরেই শুষ্ক গিরিনদ অজয় তিনদিনের অতিবৃষ্টিতে কূলেকূলে ছাপাইয়া জলময়

ফাঁপিয়া ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিয়াছে। তাহার উপরের পুলের চিহ্নমাত্র নাই, ভীষণ জলের সঙ্ঘাতে পুল ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ভাসিয়া গিয়াছে!

আমি নিমেষে বুঝিলাম, ছায়ামূর্ত্তির ইঙ্গিতে না থামিয়া আমি যদি সমভাবে গাড়ী চালাইতাম, তাহা হইলে পনর হাত পরেই মোড় ফিরিয়া গাড়ী সেই ভয়ঙ্কর বেগবান নদের মধ্যে যাইয়া পড়িত, ২৫।৩০ জন প্যাসেঞ্জারের একজনও সেই অন্ধকার রাত্রিতে সেই ভীষণবেগে প্রবাহিত বিশাল জলরাশির কবল হইতে উদ্ধার পাইত না!

স্বর্ণের জন্য একটা অসীম ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা আমাকে এমন অস্থির করিয়া তুলিল যে সাহেব দুইজনের অজস্র ধন্যবাদ ও শেকহ্যাণ্ড এবং সাক্ষাৎ মৃত্যু-হইতে রক্ষা পাওয়ায় অন্য সকলের আনন্দ-কোলাহল ও আমার স্তুতিনাদ আমার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। আমি তাহাদের সকলকে সেই নদীতীরে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে তাহারাও একে একে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সম্মুখে যাইবার পথ নাই, অতএব সাহেব আমাকে গাড়ী লইয়া হাজারিবাগে ফিরিতে বলিলেন। আবদুল ও অন্য একজন লোক লণ্ঠন জ্বালিয়া সেই ভাঙ্গা পুলের নিকট বসিয়া রহিল।

বাসায় ফিরিয়া দেখি, স্বর্ণ আমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

এই ব্যাপারটি ছাপার অক্ষরে আষাঢ়ে বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই গাড়ীতে, সেই রাস্তায়, সেইরূপ অন্ধকার রাত্রিতে রামলালের পার্শ্বে বসিয়া তাহার বেদনা-কম্পিত করুণ-স্বরে বর্ণিত এই কাহিনীটি শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম, ঘটনাটি যে অসম্ভব তাহা ভাবিবার অবসর হয় নাই। গাড়ী এক-একটা বাঁকের নিকট উপস্থিত হইলেই মনে হইতেছিল, হয় ত সম্মুখের গাছগুলার উপর সেই ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইব।

পরদিবস দিনের আলোতে ব্যাপারটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম যে তাহারা ছায়ামূর্ত্তির কথা না জানিলেও এ কথা জানে যে, রামলাল একদিন অন্ধকার রাত্রিতে ভাঙ্গা পুলের নিকট হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া ২৫।৩০ জন যাত্রীকে মৃত্যুমুখ হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছিল এবং এজন্য তাহার মনিব তাহার কুড়ি টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন! অতএব ঘটনাটি যে অনৈসর্গিক, সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল।

বিকালে রামলাল দেখা করিতে আসিলে আমি এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে বলিলাম যে, শুদ্ধ-আত্মারা পরলোকে যাইয়াও স্নেহাস্পদের ও অন্য লোকের হিতসাধন করিয়া থাকেন, তাহার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই

এ সকল বিশ্বাস করেন না। এই ঘটনাটির যথেষ্ট, অকাট্য প্রমাণ আছে সুতরাং থিয়সফিকাল সোসাইটির জর্ণালে ইহা প্রকাশ করিয়া আমি অবিশ্বাসীদের গর্ব্বচূর্ণ করিব।

একথা শুনিয়া রামলালের মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, লোক মরে গেলে তার আত্মা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয় কি?
আপনাদের থিয়সফিক্যাল সোসাইটি এ সম্বন্ধে কি বলে, সেই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব বলে এসেছি!"

আমি বলিলাম, "এই প্রশ্নের সঙ্গে ছায়ামূর্ত্তির ব্যাপারটার সম্পর্ক কি, বুঝতে পারলুম না!"

রামলাল বলিল, "সম্পর্ক আছে। একটা কথা এ পর্য্যন্ত আপনাকে বলি নি; কিন্তু আপনি যখন ঘটনাটিকে অনৈসর্গিক বলে বিশ্বাস করেন, তখন আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নেই। যখন সাহেব দুইজন আর প্যাসেঞ্জাররা সেই ভাঙ্গা পুলের কাছে দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল করতে লাগল, আর তাদের সঙ্গ বিরবৎ বোধ হওয়ায় আমি একা গাড়ীতে ফিরে এলুম, তখন গাড়ীর সম্মুখের ল্যাম্পটার দিকে নজর পড়ায় দেখি ল্যাম্পের দরজাটা অল্প ফাঁক হয়ে আছে। বোধ হয়, ল্যাম্প জ্বালাবারা পর তার দরজাট বন্ধ করবার সময় আটকাবার হুকটা ঠিক জায়গায় পড়ে নি, রাস্তায় যেতে যেতে ল্যাম্পের

দরজাটা অল্প খুলে গেছে। সেটা বন্ধ করে দিতে গিয়ে দেখি, ল্যাম্পের ভিতরে একটা বড় ফড়িং মরে পড়ে রয়েছে। তখনই ছায়ামূর্ত্তির উৎপত্তির কারণ বুঝতে পারলুম।”

রামলালের এই কথাটী শুনিয়া আমার নিকট ছায়ামূর্ত্তির রহস্য মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হইয়া গেল। অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার আবিষ্কার-জনিত উৎসাহের সপ্তস্বর্গ হইতে সবেগে মাটিতে আসিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, ফড়িংটা ল্যাম্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পলাইবার জন্য উড়িয়া উড়িয়া ল্যাম্পের সম্মুখের কাচের উপর পড়িতেছিল, আর ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মত তাহারই ছায়া সম্মুখের গাছপালার উপর পড়িয়া স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্ত্তির মত দেখাইতেছিল। ছায়াতে তাহার মাথাটা অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের মাথার ছায়ার ন্যায় বোধ হইতেছিল; তাহার দেহের উর্দ্ধ্বের ও নিম্নভাগের ছায়া স্ত্রীলোকের বস্ত্রাবৃত উর্দ্ধ্বের ও নিম্নদেহের ছায়ার ন্যায় দেখাইতেছিল, এবং তাহার ঘনসঞ্চালিত পাখা দুইটার ছায়া প্রসারিত অঞ্চলাবৃত হস্তের আন্দোলন বলিয়া বোধ হইতেছিল!

কঠিন সত্যের কঠোর আঘাত হইতে আমি একটু সামলাইয়া উঠিলে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রামলালকে বলিলাম, “স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, সেই ফড়িংটার ছায়াকে আপনি স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্ত্তি মনে করেছিলেন। এ কথা জেনেও আপনি ব্যাপারটাকে ভৌতিক ব্যাপার বলে পরিচয় দিচ্ছেন কেন, আর এসম্বন্ধে

থিয়সফিক্যাল সোসাইটিকেই বা আপনি কি জিজ্ঞাসা করতে চান?”

রামলাল বিস্ফারিতলোচনে আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “এ দেশের সাঁওতাল আর কোলেরা বলে, মানুষ মরে গেলে তার আত্মা বাঘ বা ফড়িংএর দেহে আশ্রয় নেয়। আমার এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। আপনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মেম্বর জেনে এ বিষয়ে আপনাদের মত জানবার ইচ্ছা হয়েছে।” এই বলিয়া সে বুক-পকেট হইতে একটা টিনের পানের-কৌটা বাহির করিয়া অতি সন্তর্পণে খুলিয়া দেখাইল। দেখিলাম, কৌটার মধ্যে তুলার উপর একটা অর্দ্ধদগ্ধ ফড়িং।

রামলাল সেই ফড়িংটির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু হইতে দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। আমিও নিজের চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। পাছে সে দেখিতে পায় এই ভয়ে, তাহার অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিলাম; কিছুক্ষণ পরে রামলাল গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কৌটাটি বন্ধ করিয়া বুকপকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, “বুকে থাকলে আমার জ্বালা কম হয়; তাই একে কখনও কাছছাড়া করি না।”

হায় রে মানুষের অন্ধ মায়া!

# বঞ্চিতা।

সে বৎসর অতিরিক্ত বর্ষা পড়িয়াছিল, ভাদ্রমাস ব্যাপিয়া অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আশ্বিন মাস পড়িতেই আকাশের মেঘ ও বাতাসের গুমট কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুশীতল বায়ুর সুখময় স্পর্শ ও তরল সোণালী রৌদ্রের শোভা মন আনন্দে অধীর করিয়া তুলে এবং স্বচ্ছ নীল প্রশান্ত আকাশের দিকে চাহিলে একটা অব্যক্ত গভীর ভাব হৃদয়ের অন্তস্তল-পর্য্যন্ত প্রবেশ করে।

এখনও পূজার দিন দশ বার বাকি আছে কিন্তু ইহারই মধ্যে শক্তি-পুরের ন্যায় ক্ষুদ্র মফস্বল সহরেও চারিদিকে আয়োজনের ব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। ব্যবসায়ী পসারীদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, শশব্যস্তে নূতন আমদানী মালে দোকান সাজাইতেছে; এদিকে প্রত্যহ খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে, বাজারে ইহারই মধ্যে চতুস্পার্শের গ্রাম্য লোকদিগের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। সহরে যে দুই চারিজন ভদ্রলোকের বাড়িতে পূজা হইবে তাহাদের তো কথাই নাই, কর্ত্তাগৃহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সাত বৎসরের খুকিটি পর্য্যন্ত প্রত্যুষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত

ফরমাস খাটাইতে বা খাটিতে ব্যস্ত। আমাদের সাব্‌ডিভিশনাল কাছারিগুলিতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাতি জ্বালাইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কারণ, যে ছুটির পূর্ব্বে হাতনাগাত কার্য্য তুলিয়া দিতে না পারিবে তাহার ছুটি পাওয়া দুষ্কর হইবে; আমলারা নিজ নিজ দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, হাকিমশ্রেণীর যে দুই চারি-জন এখানে আছেন তাঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে "কি হে এবার ছুটিতে কোথা যাচ্ছ" "কবে যাওয়া ঠিক করলেন", "সাহেবের হুকুম এল" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এখানে আমি ও পরেশ এই দুইজন সাব্‌ডেপুটি। ছুটিতে এক সময়ে আমাদের দুইজনের কর্ম্মস্থল হইতে অনুপস্থিতি কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। পরেশ এবার পূজার ছুটিতে বাটি যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে সুতরাং আমাকে থাকিতে হইবে; কিন্তু চারিদিকে ব্যস্ততা ও উৎসবের আয়োজন দেখি মা বাটি যাইবাব জন্য আমার মনটা উতলা হইয়া উঠিয়াছে; স্থির করিয়াছি আমাদের সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার বিজয় বাবুকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে পরেশ আটদিন ছুটি পায় এবং আমি বাকি চারদিন পাই, তাহার চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্যে একদিন রবিবার প্রাতে বিজয় বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

বিজয় বাবু তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়া ক্ষৌরি হইতেছিলেন; আমাকে ভিতরে যাইয়া বসিতে

বলিলেন। বিজয় বাবু লোকটি বড় ভাল, তাঁহার বেঁটে নাদুশ নুদুশ কাল চেহারা, ভারি ভারি মুখ ও ছোট চোখ দেখিলে তাঁহাকে নিরীহ ও স্থূলবুদ্ধি বোধ হয়; কিন্তু তিনি বর্ণচোরা আম, প্রকৃত পক্ষে বিলক্ষণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সরকারি কার্য্যে বিচক্ষণ, আইন কানুন ও নজির তাঁহার নখাগ্রে, ধীরে ধীরে কথা বলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে মধ্যে রসিকতার বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, এজলাসে বসিয়া গম্ভীর মুখে এমন এক একটি কথা বলেন যে, তাহাতে হাসির রোল উত্থিত হয়, গল্প বলিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমরা তাঁহার কাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ ও বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার পাই, তিনি যে আমাদের উপরওয়ালা তাহা তিনি জানিতেই দেন না।

ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইয়া গেলে বিজয় বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, চাকরে গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া গেলে, তিনি গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন "আজকাল সকাল বেলাটা কেমন পূজো পূজো মনে হয়, দেখেচ ?"

আমার বক্তব্য উত্থাপন করিবার সুবিধা পাইয়া বলিলাম "হাঁ, আর পূজো তো এসে পড়ল।"

"ভাল কথা, ছুটির ভিতর কোন্ কোন্ দিন ট্রেজরি খোলা থাক্‌বে বল তো আমি ভুলে গেছি। আমি সেই বুঝে—"

এমন সময় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সুরেন্দ্র সিংহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে

কথা বলিতে বলিতে পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই আমার ছুটির কথা বলিবার আশা অন্তর্হিত হইয়া গেল, কারণ তাহার সাক্ষাতে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সে তো উড়াইয়া দিবেই, উপরন্তু আমাকে কটু কাটব্য শুনাইয়া দিবে।

পরেশ ঘরে প্রবেশ করিয়াই কলরব করিয়া বলিল "দেখুন মশাই, পুলিশের জুলুম দেখুন, আপনি আমাদের উপরওয়ালা, আপনার কাছে আপীল করছি।"

বিজয় বাবু। বস বস, এস মিষ্টার লায়ন্, বস। ব্যাপার কি ?

পরেশ। দেখুন দেখি মশাই, সিঙ্গি বলে কি না আজই জঙ্গমপুরের মারপিঠের মামলার তদন্ত করতে যেতে হবে। এখনও রাস্তায় এক হাঁটু জল কাদা, আমি সেই কাদা ভেঙ্গে দশ ক্রোশ গিয়ে পঞ্চাশজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বকাবকি করে রবিবারটা মাটি করব ?

বিজয় বাবু হাসিতে হাসিতে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সুরেন্দ্র সিংহের দিকে চাহিলেন। সে চসমা মুছিতে মুছিতে বলিল "কয় দিন হতে কেস্‌টা পড়ে আছে, দুই পক্ষই পরস্পরের সাক্ষী ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে, সে জন্য তিনিকে বলেছি যে আজ রবিবারটা আছে, হাঙ্গাম নিপত্তি করে আসুন। এইতে তিনি পুলিস আর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে সমভাবে গালাগলি করছেন আর ফাল পাড়ছেন।"

ইন্‌স্পেক্টার ফরিদপুর জেলার লোক, ভাষায় ও কথার টানে এখনও তার কিছু কিছু চিহ্ন আছে।

বিজয় বাবু। "বাস্তবিক, কেস্‌টা আর ফেলে রেখ না পরেশ। জান ত কি রকম জেদের মামলা, শেষকালে সাহেবের কাছে হয়ত দেরী হচ্ছে বলে নালিশ করবে; তখন মুস্কিল হবে।

পরেশ হতাশের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাল ভাল করে গেলুন কেলোর মার কাছে—"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। এমন সময় বিজয় বাবুর আরদালি পোষ্টঅফিস হইতে তাঁহার ডাক আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। বিজয় বাবু একবার চিঠিগুলার উপরটা দেখিয়া লইয়া আবার রাখিয়া দিলেন। তাহার মধ্যে একখানা পুস্তক দেখিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি ক্যাটালগ নাকি? বিজয় বাবু বলিলেন "না, ওখানা মানসী।" "মানসী? একবার দেখতে পারি কি?"

উপরের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মাসিকপত্রখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পরেশ বলিল "এবার প্রভাত মুখুয্যের একটা গল্প আছে দেখছি"

বিজয় বাবু। রত্নদীপ ছাড়া আর একটা গল্প?

পরেশ। হ্যাঁ, "লেডি ডাক্তার" নামে একটা আস্ত গল্প।

বিজয় বাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন "বটে তা পড় না হে, শোনা যাক।"

আমরা নিজ নিজ সুবিধা মত বসিলে পরেশ 'লেডি ডাক্তার' গল্পটা পড়িতে আরম্ভ করিল।

গল্পটি শেষ হইয়া গেলে সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম; পরেশ তাহার স্বভাবসিদ্ধ কি একটা রসিকতা করিল, কিন্তু তাহাতে কেহ মনোযোগ করিল না। দেখি, বিজয় বাবু অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে তাকইয়া আছেন, তাঁহার মুখে হাসির রেখা, গুড়গুড়ির নল মুখে তুলিতে অৰ্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। ক্ষণেক পরে তিনি নলটি মুখে লইয়া টানিতে টানিতে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি যখন চাটগাঁয়ে ছিলুম তখন একজন লেডি ডাক্তার নিয়ে এক কাণ্ড হয়েছিল। সেও একটা বলবার মত ব্যাপার।"

পরেশ বলিল, "ইস,, আজ লেডি ডাক্তারের জয় জয়কার দেখচি, আপনি বলুন, আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করি। আজ আর শর্ম্মা তদন্তে যাচ্ছেন না, আপনি যাই বলুন।"

সুরেন্দ্র সিংহ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি তা হলে এখন যাই, অনেক কাজ আছে। বেলা ১০টা বাজে।" তাহার স্বভাবই এই; বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ এমন কোন কথা উত্থাপন করে যাহা বলিয়া

শেষ করিতে দশ পনর মিনিট সময় লাগিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার যত কার্য্যের কথা মনে পড়িয়া যায়।

বিজয় বাবু বলিলেন, "বস না হে, এত কি কাজ? না হয় তোমার ডায়ারিতে লিখো আজ সকালটা এখানে কাটিয়ে গেছ।"

পরেশ গম্ভীর, মুখে বলিল, "ওকে ছেড়ে দিন মশাই। একজন আসামীর সঙ্গে ওর বন্দোবস্ত হয়েছে, আজ সাড়ে দশটার সময় সে ওর ছেলেদের পাণ খাবার জন্যে কিছু দিয়ে যাবে। সময়ে না গেলে ফস্কে যেতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টার অপ্রসন্ন মুখে আবার বসিয়া পড়িল। পরেশ হাসিয়া বলিল, "আপনি তাড়াতাড়ি আরম্ভ করুন বিজয় বাবু, লেডি ডাক্তারের কাহিনী শুনে পুণ্য অর্জ্জন করবার জন্যে মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

গুড়গুড়িতে দীর্ঘ টান দিয়া বিজয় বলিলেন, "শোন তবে।"

( ২ )

আমি চাটগাঁয়ের দিনহাটা সাব্‌ ডিভিশনের চার্জ্জে ছিলাম জান ত? দিনহাটায় একটি ক্ষুদ্র জেনানা হাসপাতাল আছে। হাসপাতালটিতে একজন মাত্র লেডি ডাক্তার আছে—তাছাড়া অবশ্য ভাল দাই টাই আছে। সেখানকার এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রায়ই হাসপাতালে গিয়ে দেখে

শুনে আসে, আর সব্‌ডিভিশনাল অফিসার হলেন হাসপাতাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ জেনানা হাসপাতালের বড় কর্ত্তা।

আমি যখন দিনহাটায় যাই, তার মাস চারেক আগে একজন নতুন লেডি ডাক্তার এসেছে, তার নাম মিস্ ক্ষুদীবালা বিশ্বাস, জাতি ক্রিষ্টান, বাড়ি কলকাতার দক্ষিণে কোন্ গ্রামে। খোঁজ নিয়ে জানলুম ইনি ক্যাম্বেলের পাস; আগে অন্য দুচার জায়গায় কাজ করেছেন, দিনহাটায় ইতিমধ্যেই কাজে বেশ সুনাম কিনেছেন।

দিনকতক পর থেকেই কিন্তু লেডি ডাক্তারের সম্বন্ধে একটা কাণাঘুষা শুনতে লাগলুম। আমি প্রথমে কথাটায় বড় কাণ দিই নি, কারণ ব্রাহ্মিকা কি বাঙ্গালী ক্রিষ্টান স্ত্রীলোকের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটান রোগ যে আমাদের ভিতর কি রকম প্রবল, তা আমি বিলক্ষণ জানতুম। কিন্তু যখন পাঁচ সাত জনের কাছে ঐ ভাবের কথা শুনলুম, তখন হাসপাতাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়ে আর কি করে চুপ করে থাকি? ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে একটু খোঁজ নিতে হল তার ফলে এইটুকু জান্‌তে পারলুম যে, মিস বিশ্বাস পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, এমন কি কেউ কেউ তাঁর বাসায় যাতায়াত করে, কিন্তু কি ভাবে আর কার সঙ্গে মেলামেশা করেন সেটা কেউ বলতে পারলে না। মোটের উপর সত্য সত্য কোন দুষ্য ঘটনা কি অন্যায় আচরণের কথা শুনতে পেলুম না।

একদিন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রমথ বসুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁ প্রমথবাবু, আপনাদের লেডি ডাক্তারের নামে এসব কি শুনছি ?"

ডাক্তার বাবু, বল্লেন, "আপনিও যেমন, কতকগুলো লোক আছে অসহায় স্ত্রীলোকের নামে বদনাম দিতে ভারি মজবুৎ। আমি মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে চার পাঁচ মাস কাজ করছি, তাঁর বাসাতেও মাঝে মাঝে যাই, আমি বলতে পারি তিনি খুব ভাল লোক।"

প্রমথ বসু লেডি ডাক্তারের বাসায় যাতায়াত করেন শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কারণ তিনি বেজায় গোঁড়া হিন্দু, আর স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন, সে কথা লোকের মুখেও শুনেছি, আর একদিনের ঘটনায় নিজেও দেখেছি। আমি বলে উঠলুম, "আপনি যে বড় 'স্বাধীন-জেনানা'র সঙ্গে মেশেন ? এই না সে দিন আপনি স্ত্রীস্বাধীনতার ফল বিষম হয় বলে বেচারাম বাবুর সঙ্গে ভয়ানক তর্ক করছিলেন ?"

ডাক্তার প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন, তার পর বল্লেন, আমার মত যা তাই আছে কিন্তু সেটা এ ক্ষেত্রে খাটে না। মিস বিশ্বাসের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে তাঁকে আর পর বলে মনে হয় না। আমি তাঁকে দিদি বলে ডাকি। তা ছাড়া তিনি এক বুড়ি পিসির সঙ্গে এখানে থাকেন; বিশেষতঃ মিস্ বিশ্বাস বড়ই

সরলা, দুই একজন এর মধ্যে advantage নেবার চেষ্টা করেছে। আমি না থাক্‌লে তাঁকে বেগ পেতে হত।"

শেষ কথা কয়টি ডাক্তার বেশ গরম হয়ে বল্লেন। তার কৈফিয়ৎ আর রকম সকম আমার মোটেই ভাল লাগল না। আমি মনে মনে ঠিক করলুম দুই একদিনের মধ্যে জেনানা হাসপাতাল দেখতে গিয়ে সুবিধামত মিস্ বিশ্বাসকে একটু সাবধান করে দিয়ে আসব।

এই ভেবে একদিন হাসপাতাল দেখতে উপস্থিত হলুম। মিস্ বিশ্বাসের বিষয়ে গুজব শুনে তার চেহারা সম্বন্ধে আমার মনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে চোখে দেখে বড়ই নিরাশ হয়ে গেলুম। দেখলুম তার বয়স আন্দাজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে, শরীর দোহারা বলা যেতে পারে, রং ময়লা, মুখেরও কোন চটক নাই, বিশেষত্বের মধ্যে গরুর মত বড় বড় ভাবহীন চোখ। দেশী ক্রিশ্চান স্ত্রীলোকেরা যেমন সাড়ির সঙ্গে জুতো মোজা জ্যাকেট পরে, সেই রকমের পোষাক, তবে তাতে কোন রকম বাহারের চেষ্টা নেই, নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের সাজসজ্জা।

পরেশ বলিয়া উঠিল "আরে রামঃ, আর আমার শোনবার ইচ্ছে নেই, আপনি তাড়াতাড়ি গল্প শেষ করুন।"

বিজয়বাবু বলিতে লাগিলেন "তাকে দেখে প্রথমটা আমার মনটাও কেমন দমে গিয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা

বলার পর আর সে ভাবটা রইল না। তখন আর মানুষটাকে নিতান্ত খারাপ লাগল না, তার চোখে মুখে একটা শান্ত মাধুর্য্যের ভাব দেখতে পেলুম, বোধ হল তার প্রকৃতিটি বেশ নরম, আর মনে মায়ামমতা বেশী।"

পরেশ বলিল, "আমরা মনে করি আপনি Tenancy Rights এর হিষ্ট্রী আর Sericultureএর তত্ত্ব নিয়েই থাকেন, আপনি যে আবার physiognomyর চর্চ্চা করে থাকেন, তা ত জানি না।"

বিজয়বাবু বলিলেন, "কেন, এ আর আশ্চর্য্য কি! কোন কোন লোকের সঙ্গে দু দণ্ড কথা বললে কি মনে হয় না যে এ লোকটি বড় ভাল মানুষ, কি এ ভারি ফিচেল, কি মানুষটার নিশ্চয় নিষ্ঠুর স্বভাব? মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে খানিক কথাবার্ত্তা বলে আমার সেই রকম একটা ধারণা হ'ল। হাসপাতাল দেখা হয়ে গেলে বল্লুম, 'চলুন না আপনার খাস কামরায় বসে একটু গল্প স্বল্প করা যাক।' তার পর সেই ঘরে গিয়ে নিরিবিলি পেয়ে দু চারটা বাজে কথার পর সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার বক্তব্যটা বলে ফেল্লুম।

আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ অধোবদনে থেকে আস্তে আস্তে সে বল্লে, "মিষ্টার গাঙ্গুলি, আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, তার জন্যে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বুঝতে পারছি আমার ভালর জন্যেই বলছেন, কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বলছি

যে, আমার সাবধান হবার কিছু নেই। অপরাধের মধ্যে আমার পরিচিত ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে আমার বাসায় গিয়ে অনুগ্রহ করে দেখাশুনা করেন। আপনি বুঝে দেখুন, আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন নয়; তার পর আমি যে কাজ করি, তাতে পর্দ্দানশীন হলে চলেও না। তা ছাড়া আমি একলা থাকি না, আমার পিসিমা সঙ্গে আছেন। এ অবস্থায় আমার বন্ধুরা আমার ওখানে গেলে কি দোষ হয় বুঝতে পারি না। ভদ্রলোক বাড়ীতে গেলে ত তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারি না।"

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "অপমান করে তাড়িয়ে দিবেন কেন? এখানকার কোন লোক আপনার আত্মীয় কি, আগেকার পরিচিত নয় ত, আপনি এখানে আসবার পর তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তারা শুধু শুধু আপনার বাসায় যাতায়াত করে কেন, তার অবশ্যই কারণ আছে। তারা আর কারুর বাড়ীতে এত ঘন ঘন যাতায়াত করে কি?"

কথাটা বড় রূঢ় হয়েছিল—হাকিমি মেজাজ কি না, তাঁবেদারের মুখে প্রতিবাদ শুনেই জ্বলে উঠেছিল। আমার কথা শুনে মিস্ বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বল্লে "আপনি পাকে প্রকারে বলছেন যে, আমি তাঁদের আসতে বলি, কিম্বা গায়ে পড়ে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা

করি, তাই তাঁরা আসেন। আপনি ভুল বুঝেছেন মিঃ গাঙ্গুলি! আমি আস্কারা দেওয়া দূরে থাক, অনেক সময় তাঁদের আনা-গোনায় বিব্রত হয়ে পড়ি।"

আমি বলে উঠলুম "এই না আপনি বলছিলেন তাঁরা অনুগ্রহ করে দেখাশুনা করতে আসেন, আবার এখন বলছেন তাঁদের আনাগোনায় আপনি বিব্রত হন!"

তার কথায় অবিশ্বাস করছি দেখে এবার মিস্ বিশ্বাসের সত্য সত্যই ধৈর্য্যচ্যুতি হল, বেশ গরম হয়ে বল্লে, "যাঁরা বলেন যে তাঁরা আমাদের খোঁজ খবর নিতেই আসেন, তাঁদের কি বলা যায় 'আপনারা আর আসবেন না, আপনাদের আনাগোনায় আমরা বিব্রত হয়ে উঠেছি?' আমি কখনও কারুর মুখের উপর কিছু বলতে পারি না, যখন কেউ ভাল উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে একটা অন্যায় করে ফেলেন তখন ত আরও চুপ করে যাই। এই দেখুন না, আপনি ঘণ্টাখানেকের পরিচয়ে আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বলছেন তাতে আমার আপত্তি করা উচিত কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য ভাল জেনে কি করে আপত্তি করি? আপনি আমার বিব্রত হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু সব কথা শুনে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবেন না। কোন কোন ভদ্রলোক আছেন দিন নেই দুপুর নেই আমার বাসায় উপস্থিত হন, কেউ কেউ আবার দিন দুবেলা তিনবেলা

আসেন, একবার এলে সহজে যেতে চান না। বেশি কি বলব, দু একজন ভদ্রলোক আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেছেন।” এই কথা বলতে বলতে মিস্ বিশ্বাসের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি ত অপ্রস্তুতের একশেষ। শশব্যস্তে ক্ষমা চেয়ে তাকে সান্ত্বনা করতে প্রবৃত্ত হলুম। আমি মনে করলুম আমার কথাতেই বুঝি অপমান বোধ করে কেঁদে ফেলেছে কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলুম তা ছাড়া আরও একটা বড় কারণ ছিল। যাই হ'ক, মিস্ বিশ্বাস তখনই চোখ মুছে আমার কাছে মাপ চেয়ে অনুতপ্ত স্বরে বললে, “ছি ছি, রাগের মাথায় কি কথা বলে ফেল্লুম? আপনি দয়া করে এ কথাগুলি ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন মিঃ গাঙ্গুলি!” দেখলুম সে সত্য সত্যই ভারি লজ্জিত হয়েছে।

আমার অপ্রস্তুতের ভাবটা কেটে গেলে মনে মহা তোলাপাড়া আরম্ভ হল। লোকের এর কাছে আসবার জন্যে এত লালায়িত হবার কারণ কি? এর না আছে রূপ, না আছে বয়স, গুণও যে তেমন বিশেষ কিছু আছে তা বোধ হল না। তবে কি দেখে লোকে এমন মোহিত হতে যাবে যে, এক দিনের মধ্যে দু তিনবার না দেখে থাকতে পারে না, আর একে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠবে? আমি ভেবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে স্থির

করলুম যে মিস্ বিশ্বাস হয় দারুণ মিথ্যাবাদী নয় তার পাগলামীর ছিট আছে।

তখন নতুন পথ ধরলুম। গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লুম "তাই ত, বিনা অপরাধে আপনাকে আচ্ছা নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে ত? কে কে আপনাকে এ রকম করে বিরক্ত করে বলুন ত, আমি তাদের দেখে নিচ্ছি।"

মিস্ বিশ্বাসের মুখ শুকিয়ে গেল, সে কাতর স্বরে বলে উঠল, "না না মিষ্টার গাঙ্গুলি সে কিছুতেই হতে পারে না। দোহাই আপনার, এ কথা নিয়ে গোলযোগ করবেন না। আমি কারুর নাম বলতে পারব না, আমায় মাপ করুন।"

তার রকম দেখে আমার মনে হল, তার নির্দ্দোষীতার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আসল কথাটা জানবার জন্যে আরও জেদ বেড়ে গেল। আমি বল্লুম, "দেখুন মিস্ বিশ্বাস, আপনার নামে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে, তার উপর আপনি নিজে জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে। আর যখন এখানে আপনার কেউ অভিভাবক নেই, তখন আমাকেই এ কাজের ভার নিতে হবে। আপনি যাতে লজ্জা কি কষ্ট পান তেমন ভাবে আমি কাজ করব না; আর আপনার মত না নিয়ে কাউকে কিছু বলব না, তা আমি প্রতিজ্ঞা করছি। কিন্তু কি ভাবে চলতে হবে তা ঠিক করতে হলে কি ধরণের লোক

আপনাকে জ্বালাতন করে সেটা জানাতে হবে তো? আপনি অন্ততঃ একজনের নাম বলুন না—কোন ভয় নেই, আমার দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হবে না।"

একটু ইতস্ততঃ করে, তর্জ্জনী দিয়ে টেবিলের একটা জায়গা ঘস্‌তে ঘস্‌তে মিস্ বিশ্বাস আস্তে আস্তে বল্লে, "এই আপনাদের ডাক্তার বাবু একজন।"

আমি তো অবাক। মিস্ বিশ্বাসের সম্বন্ধে প্রমথবাবুর সন্দেহ জনক কথাবার্ত্তা মনে পড়ায় ভাবলুম মিস্ বিশ্বাসের কথাটা তো তা হলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যতই ভাবি ততই আশ্চর্য্য বোধ হয়। প্রমথবাবুর মত লোক কিসের জন্য এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবে। এ রহস্য ভেদ করবার জন্যে আমার ভারি ঝোঁক হল। সোজা ভাবে যখন হল না, তখন কৌশলে ভিতরকার কথাটা জেনে নেব ঠিক করে মিস্ বিশ্বাসের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম, বলে এলুম আমি এর পরে যা হয় একটা উপায় স্থির করিব।

ভেবে চিন্তে এই মৎলব করলুম যে, কোন বিশ্বাসী লোককে মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে দুচার দিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে বলে দেব, তার পর কৌশলে তার কাছ থেকে এ ব্যাপারের আসল হাল জেনে নেব। একবার মনে হয়েছিল নিজেই মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ব্যাপারখানা বুঝে নি; কিন্তু আমার সে সময়ও নেই, আর

কাজটা আমার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত হবে না বুঝে সে মৎলব তথনই ত্যাগ করলুম।

আমার আফিসে ইবন্ আহম্মদ বলে একজন আধাবয়সী মুসলমান ছিল। সে আফিসের কাজে যেমন অকর্ম্মণ্য ছিল, তেমনি আয়েসের সুখটুকু তার যোল আনা ছিল। যতক্ষণ আফিসে থাকিত ততক্ষণ গজ গজ করিত,—সেরিস্তাদার খাটিয়ে জান নিলে, এই গরমে কি কাজ করা যায়, চেয়ারে ভয়ানক ছারপোকা, টিফিনের ঘরে পাখার দরকার ইত্যাদি। লোকটা কিন্তু বাজে ফরমাস খাটতে ভারি মজবুদ; আর সেই গুণে উপরিওয়ালাদের সন্তুষ্ট রাখত। কোন হাকিম মুরগীর ডিম খান, ইবন্ আহম্মদ সস্তায় কিনে এনে দেবে; কারুর বাড়িতে রুগীর জন্য সুরুয়া দরকার, ইবন্ আহম্মদকে বল্লেই হল; কারুর গর হজম হয়েছে, ইবন্ আহম্মদ বাড়ি থেকে 'সরবতে নীলুফা' আনতে ছুটিল, এই রকম। তার আর একটা গুণ ছিল; সব রকম লোকের সঙ্গে সহজে আলাপ করে লম্বাচৌড়া কথা বলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা করে নিতে পারত।

এই ইবন্ আহম্মদকে গোয়েন্দা করব ঠিক করে ডাকিয়ে বল্লুম "দেখ, মুন্সী সাহেব, একটা ভারি গোপনীয় ব্যাপারে ডিটেক্‌টিভগিরি করবার জন্যে একজন বুদ্ধিমান আর বিশ্বাসী লোক চাই। তা তুমি ছাড়া সে রকম লোক আর দেখতে পাচ্ছি

না। কাজটা পারবে কি?" সে তো অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে উঠল, "আলবৎ পারবো!" তখন আমি বল্লুম, "আমাদের সন্দেহ হয়েছে লেডি ডাক্তার মিস্ বিশ্বাসের বাসায় জুটে জন কতক লোক পোলিটীকাল চক্রান্ত করছে। তোমাকে মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করে জানতে হবে সেখানে কে কে যায় আসে, তারা কি করে, কি রকম কথাবার্ত্তা বলে, আর মিস্ বিশ্বাস তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। তিন দিন পরে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করবে এ বিষয়ে তুমি কি সন্ধান পেলে। এ তিন দিন তোমাকে কাছারিতে আসতে হবে না।"

পরেশ বলিয়া উঠিল "আপনি ত বেশ লোক, একজন ভদ্র-মহিলার উপর অনায়াসে চর লাগালেন?"

বিজয় বাবু বলিলেন "তুমি ভুল বুঝেছ। আমি মিস্ বিশ্বাসের দোষ ধরব বলে এ কাজ করিনি, তাকে এই অত্যাচার আর বদনাম থেকে রক্ষা করব ভেবেই করেছিলুম। আমার ধারণা হয়েছিল সে কতক ভালমানুষীর জন্য আর কতক লজ্জার খাতিরে এই উপদ্রব সহ্য করছে। আমি সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এই ভাবে তাকে উদ্ধার করব। অবশ্য কেবল এই সদিচ্ছার জন্য এতটা করতুম না। কিসের আকর্ষণে লোকে তার সঙ্গ চায় সে বিষয়ে খুব কৌতূহল হয়েছিল বলেই সদিচ্ছাটা কাজে পরিণত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, তা স্বীকার করছি।

যাক, ইবন্ আহম্মদ একটা মস্ত কাজের ভার পেয়েছে মনে করে অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে বলে গেল যে তিন দিনেই সে কাম ফতে করে ফেলবে।

চারিদিন গেল, ইবন্ আহম্মদের দেখা নেই। পাঁচদিনের দিন সকাল বেলা আমি বাড়ির ভিতর থেকে আমার বৈঠকখানায় এসে দেখি ইবন্ আহম্মদ বসে আছে। খবর কি জিজ্ঞাসা করিতেই সে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, "ভাগ্যে আমাকে পাঠিয়েছিলেন হুজুর, তা না হলে একজন বেকসুর আদমি মুস্কিলে পড়ে যেত। কোন্ সয়তান আপনাকে বলেছে যে বিশ্বাস মেম-সাহেবের কুঠিতে পোলিটিকাল বৈঠক হয়? তিনি কি যে সে আদমি, যে খারাব কামে হাত দেবে? তার কি মিঠা তবিয়ৎ, কি সরিফ্ দিল্, কি উম্‌দা সিফৎ! এক্কা ঔরৎ, এক্কা ঔরৎ (রমণীরত্ন)।"

যে ইবন্ আহম্মদের মুখে কখনও কারো ভাল শুনিনি, তার মুখে এই প্রশংসার ফোয়ারা শুনে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক আরও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠল। আমি বল্লুম "আচ্ছা মিস্ বিশ্বাস খুব ভাল লোক তা যেন বুঝলুম, কিন্তু তার বাসায় অনেকে আড্ডা দেয়, তা সত্য নয় কি?"

"আড্ডা দেওয়া কথাটা ঠিক নয় হুজুর, কতকগুলা নিকাম্মা আদমি মেমসাহেবকে সিধাসাধা পেয়ে তাঁর কুঠিতে চড়াও হয়ে, দিনরাত্ত বসে থাকে, তাদের নিয়ে মেমসাহেবের যে কত তক্‌লিফ

হয় তা বলবার যো নেই। কিন্তু তাঁর তাজ্জব সাবর, (সগুণ) হাসিমুখে সমস্ত বরদাস্ত করেন। এ সব বদমাসদের হাত থেকে মেমসাহেবকে বাঁচাবার জন্যে আমি এ কয় রোজ সারা রোজ তাঁর কুঠিতে থাকতাম, মনে করেছিলাম দু'চার রোজ এ রকম চেপে থাকলেই তারা ভাগবে। এই জন্যই আমার „ রিপোর্ট" করতে দু'রোজ দেরি হয়ে গেছে!"

ইবন্ আহম্মদের নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা শুনে হেসে উঠলুম, স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এও মিস্ বিশ্বাসের গোলাম বনে গেছে। কে কে সেখানে যায় জিজ্ঞাসা করতে ইবন্ আহম্মদ বল্লে "ঐ সব বেয়াদবদের নাম পুছা দরকার মনে করিনি। ভাল কথা, আমাদের ডাক্তার বোস সাহেব সেখানে আনাগোনা করেন দেখলাম, তিনি ত আপনার দোস্ত বল্লেই হয়; আপনি তাকে সমঝিয়ে দিতে পারেন না কি যে, ওরকম করলে মেম-সাহেবের বদনাম হতে পারে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "সেকথা তোমার ভাববার দরকার নেই, তুমি এখন যাও।" মনে মনে ভাবলুম এর মত লোককে এ রকম কাজে পাঠানই ভুল হয়েছিল।

চাটগাঁ সহরটা ফিঁকে, মেটে, কাল, হরেক রকম ফিরিঙ্গি আর দেশী ক্রিষ্টানের রাজ্য, প্রায় সব কাছারিতেই দু'চার জন ফিরিঙ্গি আছে, আমার আফিসেও ফেগ্রেডো নামে একজন বুড়ো

কাল ফিরিঙ্গি ছিল। সে এ পর্য্যন্ত বিয়ে করেনি, তাই ভাবলুম এ কাজের পক্ষে এই উপযুক্ত লোক, কেন না যে এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীর অভাব বোধ করেনি, সে বুড়ো বয়সে স্ত্রীলোকের মায়ায় বশীভূত হবে না। তাকে ডেকে পাঠিয়ে ইব্‌ন আহম্মদকে যে পোলিটিকাল চক্রান্তের তদন্তের কথা বলেছিলুল সেই কথা বলে, তিন দিন পরে রিপোর্ট করতে বল্লুম।

তিন দিন পরেই ফেগ্রেডো ফিরে এল বটে, কিন্তু তার মুখে একটা অপ্রস্তুতের ভাব দেখে আমার মনে আগে থাকতেই সন্দেহ হল। সে বল্লে যে, মিস্ বিশ্বাসের বাঙ্গলোতে পোলিটিকাল চক্রান্তের কথা যে কেবল সর্ব্বৈব মিথ্যা সুধু তা নয়, মিস্ বিশ্বাসের charmsএ (মোহিনী শক্তিতে) আকৃষ্ট হয়ে এক পাল বদমায়েস তাঁর বাঙ্গলোতে জমায়েৎ হয় বটে (a pack of Scourdrels herd together) কিন্তু তার জন্মে মিস্ বিশ্বাসকে দায়ী করাও যা, আর একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের চারিদিকে মৌমাছি জুটলে সে জন্মে গোলাপ ফুলকে দোষী করাও তাই; মিস্ বিশ্বাস এক জন পরম গুণবতী মহিলা (a lady of the highest quality) এমন কি তাঁকে একটি এঞ্জেল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি ভাবলুম "মরেছে রে, এটাও জালে পড়েছে দেখছি।" লোকটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলুম,

ভাবলুম দূর হোক্ গে ছাই, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে ?

এই সকল কথা ভাবছি এমন সময়ে আফিসের ভিতর থেকে একটা চেঁচামেচি শুনতে পেলুম, একটু পরে সেরিস্তাদার এসে বল্লে ইবুন্ আহম্মদ আর ফেগ্রেডো আফিসের ভিতর ঝগড়া করছে, তাদের থামাতে পারা যাচ্ছে না ; ঝগড়ার কারণ দুজনের কেউ স্পষ্ট করে বলছে না, তবে তারা ঝগড়া করতে করতে মাঝে মাঝে কে মিস্ বিশ্বাস আর মেমসাহেবের নাম করছে। আমি ভাবলুম,—আরে মোলো, শেষকালে আফিসের ভিতর সুন্দর উপসুন্দের যুদ্ধ! দুজনকে ডাকিয়ে আচ্ছা করে ধমক দিতে তবে তারা নিরস্ত হয়।

আমি মনে মনে মিস্ বিশ্বাসকে যথেষ্ট বাহাদুরী দিলাম ; ভাবলাম যে স্ত্রীলোক কুশ্রী হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুজন পরিণত বয়সের লোককে তিন দিনে এমন বশ করতে পারে, তার ক্ষমতা বড় সাধারণ নয়—কিন্তু এ ক্ষমতার মূল কোথায় ঘুরে ফিরে সেই পুরাণ কথাতেই এসে উপস্থিত হলাম। মনে করেছিলাম এ ব্যাপার নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না ; কিন্তু ফেগ্রেডোর আর ইবন্ আহম্মদের ঝগড়া দেখে আমার কৌতূহল দশগুণ বেড়ে উঠল; মনে হল এ রহস্য ভেদ না করতে পারলে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

এই সময় হঠাৎ মনে হল, বোধ হয় মিস্ বিশ্বাসের অনেক টাকাকড়ি আছে, আর বোধ হয় সেই সন্ধান পেয়েই গুড়ের গন্ধে মাছির ঝাঁকের মত চারিদিক থেকে তার অনুগত ভক্ত এসে জুটছে। অন্ধকার ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিল যেমন ঘরের সমস্ত জিনিষের চেহারা চোখে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি এই কথাটা মনে হওয়ায় এ ব্যাপারের যা কিছু রহস্য সমস্তই মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হয়ে গেল, আর এই সোজা কথাটা এতদিন কেন মনে হয়নি তাই আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল। মনে একটা ভারি আরাম বোধ হতে লাগল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার থিওরিটা সত্য কিনা তার প্রমাণ পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কোন রকমেই কিছু বুঝ্‌তে না পেরে শেষে ঠিক করলাম যে নিজেই অনুসন্ধান করব।

তারপর একদিন বৈকালে কাছারি থেকে ফিরে কাপড় চোপড় বদলে বেড়াতে বেড়াতে মিস্ বিশ্বাসের বাসায় উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে মিস্ বিশ্বাস ভারি ব্যস্ত হয়ে যৎপরোনাস্তি আদর অভ্যর্থনা করে তার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালে। তার আন্তরিক খাতির যত্নে আমি সত্যসত্যই খুসী হলাম।

মিস্ বিশ্বাসের বাঙ্গালা খানির সামনে একটা বারান্দার উপর দিয়ে বৈঠকখানায় আসবার সময় দেখি সেখানে জন তিন চার

লোক বসে চা খাচ্ছে। আমি বুঝলাম এরাই মিস্ বিশ্বাসের ভক্তবৃন্দ, কিন্তু বারান্দা দিয়ে চলে আসবার সময় সন্ধ্যার আব-ছায়ায় তাদের কাউকে চিনতে পারলাম না। আমি বাইরের আলো থেকে আসছি বলেই বোধ হয় তাদের ভাল দেখতে পেলাম না, তারা কিন্তু সম্ভবত আমাকে চিনিতে পেরেছিল, কারণ আমি বৈঠকখানায় বসতেই দেখি তারা একটির পর একটি সুড় সুড় করে সরে পড়ল। তাদের চিনতে পারলাম না বলে ভারি আপশোষ হতে লাগল!

মিস্ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর থেকে তার পিসিকে ডেকে নিয়ে এল, দেখলাম তাঁর ধরণ ধারণ ঠিক আমাদের ঘরের বিধবার মত। সমস্ত দিনের খাটুনির পর এতখানি হেঁটে আসতে আমার কত কষ্ট হয়েছে বলে আক্ষেপ করে তিনি আমার বারণ অগ্রাহ্য করে একখানা হাতপাখা এনে আমাকে বাতাস করতে করতে করুণামাখা স্বরে বল্লেন, "তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেছে বাবা। বলতে ভরসা হয় না, যদি কোন আপত্তি না থাকে একটু চা টা খাওনা।" তাঁর অকপট যত্ন আমার ভারি ভাল লাগল, বল্লুম, "খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমার কোন বাধা নেই, তবে বাড়ি থেকে জলটল খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর কিছু খাব না।"

চাকরে আলো দিয়ে গেলে দেখলাম যে ঘরের আসবাবপত্রে বেখাপ্পা সাহেবিয়ানা কি বাহারের চেষ্টা নেই, অথচ আরাম

এবং সুবিধার হিসাবে যা কিছু দরকার সবই আছে। সমস্ত জিনিস-পত্রের এমন পরিপাটি গোছগাছ আর চারিদিক এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরটিতে বসে আমার বড়ই আরাম আর তৃপ্তি বোধ হতে লাগল, মনে মনে মিস্ বিশ্বাসের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।

আমার উদ্দেশ্য, কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেখা, যদি কিছু খেই পাই, সুতরাং মহা গল্প জুড়ে দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে বাহিরে ভারি ঝড় উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। মনে করলাম বৈশাখী ঝড় একটু পরেই থেমে যাবে, কিন্তু যখন আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু থামবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন মিস্ বিশ্বাস ধরে বসল সে রাত্রে সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে যেতে হবে। এ অনুরোধ আমি প্রথমে উড়িয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগ্রহ দেখে শেষকালে রাজি হতে হল। মিস বিশ্বাস ভারি খুসী হয়ে বলে গেল 'আপনি পিসিমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলুন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনার খাবার তৈরি করে দেব।" আমি মনে করলাম মন্দ কি, যত বেশীক্ষণ থাকা যায়, যার জন্যে এসেছি তার মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশি। আমার অজ্ঞাতসারে সে মীমাংসার যে কত কাছে এসে পড়েছি তা বুঝতে পারিনি।

যথাসময়ে খাবার ডাক পড়তে ভিতরে গিয়ে দেখি ঠাঁইয়ের

কি পরিপাটি বন্দোবস্ত! আরসির মত পরিষ্কার চক্‌চকে সিমেণ্ট করা মেজের উপর ছাঁটা পশমের খুব পুরু একখানি আসন পাতা, তার সামনে সাদা পাথরের থালা, বাটি, রেকাবি প্রভৃতি সাজান, পাতের চারিদিকে চারটি সামাদানে মোমবাতি জ্বলছে, দুধারে দুটি বেলোয়ারি ফুলদানে ফুলের তোড়া তার মাঝখানে আবার দুটি জ্বলন্ত ধূপ বসান, ঘরের এককোণে একটা টীপায়ের উপর টুং টাং করে একটা কলের অর্গান বাজছে, সামনের খোলা জানলা দিয়ে হাস্নু-নো-হানার গন্ধ এসে ঘর আমোদ করে তুলেছে। সাদা পাথরের আর তোড়ার পবিত্র শোভা, ধূপের আর ফুলের গন্ধ, আর অর্গানের মিঠা আওয়াজে মন একটা স্নিগ্ধ পবিত্র ফূর্ত্তিতে ভরে উঠল, আসনের অতি নরম স্পর্শ যেন কার আদরের স্পর্শ বলে মনে হতে লাগল। একসঙ্গে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির আয়োজন এই নতুন দেখলাম।

ফলমূলগুলি এমন সুন্দর কারিগরি করে সাজান যে তাতে হাত দিতে মায়া হতে লাগল। বেদানার দানার পদ্মফুল, বাদামের নক্ষত্র, কিসমিসের পিরামিড, আঙ্গুরের জসম, শসার ঘুঁড়ি, কলার থাম, আকের রেলিং, মাখনের ফুলদার কল্কা ইত্যাদি। আবার কতকগুলি ফলমূল নূতন কায়দায় সাজান ঠাণ্ডা তালশাঁসের ভিতর কেওড়ার সরবৎ, লিচুর ভিতর আটির জায়গায়

সুগন্ধি পাতলা ক্ষীর, গোলাপজামের ভিতর গোলাপী সিরাপ, কালজামের ভিতর ক্রীম, ছানার ছোট ছোট গুলি আর চাক্তির ভিতর লেবুগন্ধ চিনি ভরা, এই রকম কত কি। এক একটি জিনিষ মুখে দিতে জিভ থাওয়া বন্ধ করে প্রশংসা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল!

খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম ফলমূলগুলি এমন তরিবৎ করে তৈরি করতে যে রকম পরিশ্রম আর সময় লেগেছে দেখছি তাতে বোধ হয় রান্না বান্না বিশেষ কিছু করতে পারে নি। পাতে প্রথম লুচি আর শাকভাজা দিতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। কিন্তু ক্রমে দেখলাম তা নয়, সমস্ত জিনিসগুলি গরম গরম দেবে বলে এক একটি করে পরিবেশন করেছে। জোয়ানের লুচি আর ভিনিগার দেওয়া সস্‌ দেওয়া শাকভাজা এমন মুখরোচক লাগল যে, পেলে বোধ হয় তাই দিয়েই পেট ভরিয়ে ফেলতুম; তারপর ইঁচড়ের ডালনা, কপির ছোঁকা, মটর সুঁটির ঘুগ্‌নি, আরও কি কি —অতি তোফা রান্না—যেটা খাই সেইটাই মনে হয় আগের চেয়ে এইটাই ভাল। ক্রমে তিন রকম পোলাও, একটিতে জুঁই ফুলের গন্ধ, একটিতে চিঁড়ের মত কুচি কুচি মাছ দেওয়া, আর একটির প্রত্যেক দানা সোণালি অথবা রূপালি রঙ্গের; তার সঙ্গে কত রকম মাছ আর মাংসের তরকারি, বড়া ইত্যাদি; কোনটা মোগলাই, কোনটা বা সাহেবি, তার মধ্যে কতকগুলি জিনিস আগে কথনও

খাই নি ; আর যে গুলি খেয়েছি তার প্রত্যেকটিতে এমন একটা কিছু নূতনত্ব বা বিশেষত্ব ছিল যার জন্য এতদিন পরেও সেগুলি ভুলিতে পারিনি। আমি সকাল বেলা কি দিয়ে ভাত খাই রাত্রে তা মনে থাকে না, কিন্তু সেদিন কি কি খেয়েছিলুম তা আজও মনে আছে, এই থেকেই বুঝতে পারবে সে কি রকম রান্না। বরফির আকার, ক্ষীরের তার, কমলা লেবুর গন্ধ আর মাখমের মত মোলায়েম দইএর, ফেণা ঢাকা খেজুর খোবানি জরদা আলু মেশান লাল রঙ্গের সরের মত জিনিসের ঠাণ্ডা পুডিংএর, আর অতি ফিকে টক রস আনারসের কালাকন্দের সূক্ষ্ম মাধুর্য্যকে যথাক্রমে মিষ্টান্ন রাজ্যের ললিত, সাহানা আর বেহাগ রাগিণী বলা যেতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি জিনিসের কোনটিকে ফার্ষ্ট ক্লাসের নীচে স্থান দেওয়া যায় না। আমি এই বয়সে অনেক বড়োলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি, পাকা রাঁধুনীর হাতের রান্না খেয়েছি, হোটেলেও বড় কম খাইনি, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসটি এমন উৎরাণ, আর কি কি খাওয়াতে হবে, আর কোন্‌টার পর কোনটা দিতে হবে তা ঠিক করতে এমন নিপুণ বিচারশক্তি আর কোথাও দেখিনি।

অক্ষরের মাথায় মাত্রা না দিলে যেমন সেটা সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি আমার মত চুরুট তামাকখোরদের সুখ বা আয়েসের সময় একটু ধোঁয়ামুখ না করলে পূরা তৃপ্তি হয় না। তাই

আঁচাবার সময় লেডির ঘরে ধূমপান নিষেধ ভেবে মনে মনে দুঃখ হচ্ছিল যে, এমন খাওয়ানা অঙ্গহীন হল, আর ক্রিষ্টানের বাড়ি পানসুপারি পাওয়া যাবে না বলে মনটা খুঁত খুঁত করছিল; কিন্তু বৈঠকখানায় এসে যখন দেখলুম আমার চেয়া-রের পাশে একটি টিপায়ের উপর রেকাবিতে সাজা পান, ভাজা মসলা, চিকিসুপারি, চুরুট আর দেশলাই রয়েছে, তখন অবাক্ হয়ে গেলাম। আমি তখন তাঁর রান্নার ও অন্যান্য ব্যবহারের যথেষ্ট প্রশংসা করলাম।

আমার প্রশংসা শুনে তার মুখে একটা সলজ্জ আনন্দের ভাব ফুটে উঠল, সে বল্লে "আপনি কি বলছেন তার ঠিকানা নেই, আপনার মত লোক আমার রান্না খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন এই আমার যথেষ্ট। আমার ত আর কিছু গুণ নেই, এই বিদ্যাটুকু দিয়ে যদি লোককে খুসি করতে পারি তা হলে বড় আনন্দ হয়।"

মিস্ বিশ্বাসের পিসি বল্লেন "হাঁ বাবা, ওর সখের মধ্যে ঐ এক লোক খাওয়ান সখ আছে। ছেলেবেলা থেকে ওর রান্নার উপর ভারি ঝোঁক, বাবুর্চিদের খোসামোদ করে নতুন নতুন রান্না শিখত, বড় হয়ে পয়সা দিয়ে শিখত; নানান রকম বাঙ্গালা আর মোগলাই রান্না শিখবে বলে দিনকতক সখ করে মিশনারিদের সঙ্গে মিশে জন কতক বাঙ্গালি বাব আর

মুসলমান ভদ্রলোকদের বাড়ি সেলাই শেখাতে যেত; আবার ইংরাজি বাংলা রান্নার বই কতক গুলো কিনেছে। এমন বাই কখন দেখেছ বাবা?"

আমি বল্লুম "তা যেন বুঝলুম, কিন্তু আমি যে থাব তা তো আপনারা জানতেন না, এরকম নানা রকম ফলমূল আর উপকরণ মায় অসময়ের কপি কড়াইসুটি এ সবই বা কোথা পেলেন আর এত অল্প সময়ের ভিতর এত জিনিসই বা কি করে তৈরি হল? এ তো আমার ভৌতিক ব্যাপার বোধ হচ্ছে।"

পিসি একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লেন 'আশ্চর্য্য হবার কথা বটে, পাগল মেয়ের ধরণ ত জান না। বাড়িতে হঠাৎ কেউ এলে তাড়াতাড়ি পাঁচ রকম রেঁধে দিতে পারবে বলে সাহেবদের মত ছটা ফোকরওলা উনুন তৈরি করেছে. তা ছাড়া ঐ যে বুড়ো বেহারাটাকে দেখলে, ও এসব কাজে খুব তৈরি, সেই জন্যে আরও শিগ্‌গির হয়।

আর জিনিসপত্রের কথা কি বলছ, মেয়ের ভাঁড়ারে দেখবে সব রকম মালমসলা মায় বিলিতি আমদানি টিনে ভরা মাছ-মাংস তরিতরকারি ফল সব মজুদ থাকে, আবার সারা বছরের যত রকম তরকারি শুবিয়ে শুকিয়ে রেখে দেয়। ও যা কিছু রোজগার করে সমস্তই এইতে খরচ করে।

বাড়ীতে যে আসবে সে যদি নিষ্ঠবান হিঁদু না হয় তা হলে তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না, সাহেবই হক, মুসলমানই হক, আর যেই হক, যে যেমন, তাকে তেমনি রেঁধে খাওয়াবে, নিদেন চা কি জলখাবার খেয়ে যেতেই হবে।”

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। যে মিস্ বিশ্বাসের বিনয়াবনত বাড়ীতে আসে কেন তার গোলাম হয়ে যায়, লোকে কেন এত ঘন ঘন এখানে যাতায়াত করে তা এইবার ভাল করে বুঝতে পারলাম।

কিন্তু এই রকম যাকে তাকে সেধে খাওয়ান আমার চোখে বড় ভাল ঠেকল না, মনে হল এটা বাহবা নেবার বড় বাড়াবাড়ি নেশা। তাই, একটু না টুকে থাকতে পাল্লাম না, বল্লাম “আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে তৃপ্ত করা স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু এমন করে পাঁচ ভূতকে খাইয়ে পয়সা নষ্ট করা কি উচিত? এতে ভাল ত হয়ই না; উপরন্তু খুব খারাপ ফল হয়। আপনার উচিত নয় কি ওঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা?”

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিস্ বিশ্বাসের পিসি বল্লেন “সে অনেক কথা বাবা। বাছা আমার বড় অভাগী। একটা ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম, অমন ছেলে হয় না, কেমন

রাজপুত্রের মত চেহারা তেমনি ভাল স্বভাব, বেশ ভাল চাকরিও করত। বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেলে ক্ষুদুর সঙ্গে চেনা পরিচয় করে দেবার জন্য তাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতাম। তাইতে দুজনের খুব ভাব হয়েছিল। সে বলত "পিসিমা, আপনার ভাইঝির মত পৃথিবীতে কেউ রাঁধতে পারে না, আমার ইচ্ছা করে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে ডেকে এনে ওর রান্না খাওয়াই।" মাসখানেক বাদে বিয়ে হবে, আমি এক এক করে ওদের ঘরকান্নার জিনিস পত্র গোছাচ্চি, এমন সময় ছেলেটার গলায় ঘা হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, তার বাপমা তিন মাস ধরে কত চিকিৎসা করালে, কিছুতে কিছু হল না। আমি মাঝে মাঝে ক্ষুদুকে নিয়ে তাকে দেখতে যেতাম; একদিন বড় ছট ফট করছে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম 'কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?' সে বল্লে "পেট জ্বলে যাচ্ছে পিসিমা; অথচ কিছু খাবার জো নেই এ বড় যন্ত্র।।!" আর একদিন ক্ষুদুকে বল্লে "দেখ, বড় ইচ্ছা করছে তোমার হাতের রান্না পেট ভরে খাই, আমি যদি ভাল হই একদিন ভাল করে রেঁধে খাইও।" বাছার সে সাধ আর মিটল না, না খেতে পেয়ে ধড়ফড় করে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।" বলতে বলতে বুড়ির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। চেয়ে দেখি মিস্ বিশ্বাস উঠে গিয়ে জানালার কাছে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, ভাবে বোধ হল কাঁদছে।

একটু সামলে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় পিসি বলতে লাগলেন "সে অনেক দিনের কথা। তারপর আমরা ওকে কত বুঝিয়েছি যে কত লোকের ও রকম হয়, তারা আবার সময়ে শোক ভুলে গিয়ে ঘরকন্না করে—আর মেয়েমানুষ, বিয়ে না করলেই বা চলবে কি করে? কিন্তু ও সেই থেকে সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, চিরকাল স্বাধীন থাকতে পারবে বলে ডাক্তারি শিখে চাকরি করছে। এত কষ্টে রোজকার-করা পয়সা পরকে খাইয়ে নষ্ট করে বলে আমি প্রথম প্রথম বুঝতে না পেরে ওকে বকতাম, কিন্তু যেদিন আমায় বল্লে 'তোমার পায়ে পড়ি পিসিমা আমার এ কাজটিতে বাধা দিও না, আমি তাঁর কথা ভেবে পাঁচজনকে খাইয়ে তৃপ্ত হই' সেদিন থেকে ওকে তো কিছু বলিই না, বরং ও সুখী হয় জেনে ওকে এ বিষয়ে সাহায্য করি।"

আমার চোখ জলে ভরে গেল, এহেন সতীর সম্বন্ধে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম বলে লজ্জায় আর ঘৃণায় মরমে মরে গেলাম, ইচ্ছা করতে লাগল মিস্ বিশ্বাসের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে ধন্য হই।

* * * * *

বিজয়বাবুর গল্প শুনিয়া আমাদের মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, পরেশ তাহা একেবারে মাটি করিয়া দিল। কয়েক

মুহূর্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "মশাই একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ দিন ত।"

"কাগজ কি করবে হে?"

"চাটগাঁয়ে বদলি হবার দরখাস্ত করব।"

# আমার শিক্ষা।

মান্দালের সহিত আজন্মের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশে ফিরিতে হইল।

স্বদেশ! যে দেশ কখনও চক্ষে দেখি নাই, তাহার প্রতি কি কখনও আন্তরিক আকর্ষণ থাকে? যে দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ও লালিত পালিত হইয়া থাকি না কেন, আমি যখন বাঙ্গালীর সন্তান, তখন বাঙ্গালাই আমার স্বদেশ; কঠোর কর্ম্ম-ক্ষেত্র সম্প্রতি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, কেতাবে যাহাই পড়িয়া থাকি, চাকরী সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিদেশী মাত্র। বিবিধ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি বটে; বিদেশে বাঙ্গালীর নাম খর্ব্ব হইতে দিব না, এই ইচ্ছা স্বতঃই অনুভব করি; এবং অভ্যাগত বাঙ্গালী সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও কুটুম্বের অধিক যত্নে ও সমাদরে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া তৃপ্তিলাভও করি; কিন্তু বর্ম্মা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় যাইতে আনন্দিত হওয়া দূরে থাক, মনে হইতে লাগিল যেন বনবাসে যাইতেছি। মনের অবস্থা এরূপ বিসদৃশ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বর্ম্মার অবশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়া, এই

দেশে দলে দলে কেরাণি পাঠাইতেছিলেন, সেই সময়ে আমার পিতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের ফলে পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সামান্য বেতনে কমিসারিয়াটের কেরাণি হইয়া এদেশে আসেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বর্ম্মা ভাষা সম্যকরূপে আয়ত্ত করিয়া মান্দালে কোর্টে উকিল হন. নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দক্ষতা ও সাধুতার গুণে কয়েক বৎসরেই বিলক্ষণ অর্থ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করেন। কি জানি কেন, যে শ্রেণীর বাঙ্গালী নিজের দেশে কোন প্রকার বিশিষ্টতার পরিচয় দেয় না, প্রবাসে সেই শ্রেণীর বাঙ্গালীর চরিত্রে বিবিধ গুণগ্রাম ফুটিয়া উঠে, সে পাঁচজনের একজন হইয়া উঠে। আমার পিতারও তাহাই হইল, ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা সৎকার্য্যে অগ্রণী হইলেন; তাঁহার অধ্যবসায়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, পরোপকারিতা ও আতিথেয়তার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। উকিল হইবার কিছুদিন পরে, বন্ধুদিগের যত্নে রেঙ্গুন প্রবাসী এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

আমার মাতার রেঙ্গুণেই জন্ম; সুতরাং স্বদেশের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। পিতা বর্ম্মায় আসিবার সময় মনের দুঃখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর কখনও দেশে ফিরিবেন না ও আত্মীয় স্বজনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। আমি বড় হইয়া অবধি কলিকাতা দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক

হইলেও, পিতামাতা একমাত্র সন্তানকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন না। এই সকল কারণে এ পর্য্যন্ত স্বদেশের সহিত আমার পরিচয় হয় নাই।

আমি ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সবে মাত্র উকিলের ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি, আমার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্নেহময় পিতা এতদিন পরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, স্বদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি আমাদের অকূলে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম। পিতা যেমন অজস্র উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই অকাতরে ব্যয়ও করিতেন। তিনি বরাবর বলিতেন— 'ছেলেরা বসিয়া খাইবে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করা পাপ;— পিতার কর্ত্তব্য, ছেলেদের যথাসাধ্য শিক্ষাদান করা এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে প্রথমটা সাহায্য করা; তাহার পর, তাহারা নিজের ক্ষমতায় যাহা পারে করিবে।' আমার অদৃষ্ট ক্রমে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতে না করিতেই তাঁহাকে হারাইলাম।

পিতা বর্ত্তমানে সংসারের কোনও খবরই রাখিতাম না। শ্রাদ্ধাদির পর, শোকাবেগ কিছু প্রশমিত হইলে দেখিলাম যে, ব্যয়সংক্ষেপ না করিলে যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে; এবং ইহাও বুঝিলাম যে আমি উপার্জ্জন না করিলে অধিক দিন চলিবে না। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে যাইয়া

দেখিলাম, বাহিরের ব্যয় কম করিলে পদে পদে পিতার নাম খর্ব্ব করা হয়, আবার নিজের আহার বা বসন ভূষণের খরচ কমাইলে শোকাকুলা মা আমার অধীর হইয়া পড়েন। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিলাম যে, মান্দালে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র না যাইলে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা অসম্ভব।

মান্দালে ত্যাগ করিবার আরও যথেষ্ট কারণ ছিল। পিতা যে বিশেষ টাকাকড়ি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতি লোকের ব্যবহারও আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বের হিতৈষী বন্ধুগণ এখন প্রায় অপরিচিতের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। যাঁহাদের সাহায্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব আশা করিয়াছিলাম, তাঁহারা সাহায্যের পরিবর্ত্তে এ সকল কার্য্যে যে সবুরের বিশেষ প্রয়োজন সে সম্বন্ধে গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ইহাও জানিলাম যে, পিতার উচ্ছিষ্টে পরিপুষ্ট দুই একজন উকিল তাঁহার বড় বড় মক্কেলদিগের নিকট যাইয়া বুঝাইয়াছে যে তাহারা পিতার নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া, তাঁহার কার্য্যের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে; সুতরাং আমার ন্যায় সদ্যঃ কলেজ প্রত্যাগত অল্প বয়স্ক যুবককে মামলা মোকদ্দমার ভার না দিয়া তাহাদেরই দেওয়া উচিত। ইহার ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল, আমি নিয়মিতরূপে কোর্টে যাইয়া প্রত্যহই রিক্ত হস্তে, শুষ্ক মুখে ও তিক্ত

হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতাম। মার নিকট এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও ব্যাপারটা তাঁহার চক্ষু এড়াইল না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"হীরু, তোর এই কষ্ট আমি আর দেখ্‌তে পারিনে। যে দিন আমার কপাল ভেঙ্গেছে, সে দিন থেকেই এ জায়গার উপর আমার বিষ দৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু পাছে তোর কোন ক্ষতি হয়, সেই ভয়ে এতদিন কিছু বলিনি। তোরই যখন কিছু হ'ল না, তখন আর বিদেশে পড়ে থেকে কি হবে? বাড়ী খানা বিক্রি করে—" বলিতে বলিতে মার শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার বড় সাধের বাড়ী—যাহা নির্ম্মাণ ও সজ্জিত করিতে সত্তর হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল—সেই বাড়ী-বিক্রয়ের কথায় মার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া আমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু সতীশের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। সতীশও উকিল, পিতার সাহায্যে এক রকম পশার করিয়াছে, তবে অন্যের ন্যায় সে সেকথা ভুলিয়া যায় নাই। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য পিতা তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। বহুকাল পূর্ব্বে, তিনি Bengali Advocate নামে প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র স্বরূপ এক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানা এখনও ধিকি ধিকি চলিতেছিল; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিতা সতীশকে সেই সংবাদপত্র খানির ভার দিয়া-

ছিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে, সম্প্রতি আমিও সংবাদপত্র খানির পরিচালনে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগদান করিয়াছিলাম; সেই সূত্রে সতীশের সহিত আমার আলাপ ও ক্রমে বন্ধুত্ব হয়। আমাদের দুঃসময়ে সতীশই একমাত্র সহায় ছিল। তাহারই উৎসাহে আমি এ কয়মাস যুঝিয়াছি, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া সেও সম্প্রতি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

মার কথা সতীশকে বলিতে তাহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। সে বলিল, "ভাই, এতদিন তোমায় আশায় আশায় রেখেছি; কিন্তু এখন বুঝছি, তোমার এখানে বিশেষ কিছু হবার সম্ভাবনা নেই—মাঝে থেকে, তোমার বাবার নাম বজায় রাখতে গিয়ে তুমি মারা যাবে। আমার তো বোধ হয়, মা যা বলছেন, তাই ঠিক। তবে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। কোর্ট থেকে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছে, 'ওখানকার ইণ্টারপ্রিটরের কাজ খালি আছে, মাইনে ২০০৲ থেকে ৩০০৲।' একবার উঠে পড়ে লেগে দেখি, যদি কাজটা তোমার হয়।" সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার জন্য সুপারিশের চেষ্টা করিল, Bengali Advocateএ লিখিল যে, পিতা পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মান্দালের জনসাধারণের উপকার করিয়া গিয়াছেন, আমার বর্ম্মাতেই জন্ম, বরাবর এদেশে

থাকিয়াই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি ও বর্ম্মীভাষা সুন্দররূপে শিখিয়াছি; সুতরাং এ পদটি আমারই হওয়া উচিত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে যখন আমাদের বংশের তিন পুরুষের বর্ম্মায় বাস নহে, তখন আমাদের domiciled বলা যায় না; সুতরাং পদটি আমি পাইতে পারি না, উহা কোন খাঁটি বর্ম্মীকে দেওয়া যাইবে।

ইহার পর যত শীঘ্র সম্ভব বর্ম্ম ত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম এবং মা ও সতীশের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, আমাদের মান্দালের বাড়ীখানি বিক্রয় হইলেই কলিকাতায় যাইয়া আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিব। বাড়ীর দর উচিত মূল্যের অর্দ্ধেকও উঠিল না। সতীশের অনেক চেষ্টার ফলে, একজন মাড়োয়ারি বত্রিশ হাজার টাকায় বাড়ীখানা কিনিয়া লইল।

সতীশ না থাকিলে কি করিতাম জানি না। কলিকাতায় আমার পরিচিত কেহ না থাকায় সতীশ তাহার একজন আত্মীয়কে লিখিয়া আমার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে ৫০৲ টাকা ভাড়ায় একখানা বাড়ী ঠিক করিল। সেই আত্মীয়টিকে এবং তাহার কলিকাতার বন্ধুবর্গকে আমার পরিচয় দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, যেন তাঁহারা সর্ব্বদা আমার তত্ত্ব

লন এবং যাহাতে আমার কাজকর্ম্মের সুবিধা হয়, সেই চেষ্টা করেন। যাহাতে আলিপুরে আমার শীঘ্র প্র্যাক্‌টিস্‌ হয় সে উদ্দেশ্যে সতীশ আর একটি ফন্দী করিয়াছিল। তাহার কথা পরে বলিতেছি।

অবশেষে মান্দালে ত্যাগ করিবার দিন উপস্থিত হইল। সে দিন সকাল হইতে মা আমার বাবার ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিলেন; আমি যখন তাঁহার হাত ধরিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম, তখন মনে হইতেছিল, বুঝি বুক ফাটিয়া যায়। পাছে মা অধীর হন, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ অনেক কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু গাড়ীখানা মোড়ের কাছে আসিলে যখন মা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে একবার দাঁড়াতে বল—জন্মের মত বাড়ীখানা একবার দেখে নি"—তখন আর থাকিতে পারিলাম না, মার কোলে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম।

ষ্টেশনে সতীশ ছিল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে আমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। ট্রেণ ছাড়িবার সময় তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—"ভাই তোমার ঋণ কখনও শুধ্‌তে পারব না",—বলিতে বলিতে আমার কণ্ঠরোধ হইল; তাহাকে কত কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। কোথায় অনিশ্চিতের মধ্যে যাইতেছি, ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে! ছয় মাস পূর্ব্বে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম যে, এই ভাবে মান্দালে ত্যাগ করিতে হইবে। কি করিলে মার মনে একটু শান্তি আসে, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে শেষকালে অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে হাতে একখানা সংবাদপত্র ছিল, সেখানা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সে খানা Bengali Advocate ট্রেণ ছাড়িবার সময় সতীশ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিল। কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছি, এক স্থানে নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া দেখিয়া মনঃসংযোগ করিয়া পড়িতে লাগিলাম। সে অংশটুকুর অনুবাদ এইঃ—

"আজ আমাদের প্রিয়তম বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ রায় মান্দালে পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতেছেন! তিনি বর্ম্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও বিখ্যাত উকিল ৺নবীনকৃষ্ণ রায়ের এক মাত্র পুত্র। শ্রদ্ধেয় নবীনকৃষ্ণের পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; কারণ, বর্ম্মাতে তাঁহার নাম জানে না, এরূপ কোন বাঙ্গালী নাই এবং তাহা ছাড়া কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম। হীরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স অল্প

হইলেও তিনি ইহারই মধ্যে পিতার ন্যায় নানা সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছেন এবং এই বয়সেই সংবাদপত্র পরিচালনের ন্যায় দুরূহ কার্য্য বৎসরাধিক কাল অতি নিপুণভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সকল প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহার এরূপ উৎসাহ যে, পিতার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও পাছে সৎকার্য্যে বাধা পড়ে, সেই ভয়ে বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন যুবকের পক্ষে মান্দালের ন্যায় ক্ষুদ্র স্থান উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে বলিয়াই তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন; আলিপুরে প্রাক্‌টিস্‌ আরম্ভ করিয়া, পরে হাইকোর্টে প্রবেশ করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি আপাততঃ ভবানীপুরে, ২৩৬নং বকুল বাগান রোডে অবস্থান করিবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, হীরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হউক, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করুন।"

ইহা পড়িয়া সতীশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরিয়া উঠিল বটে. কিন্তু তাহার উপর একটু বিরক্তও হইলাম, কারণ, ইহার অধিকাংশই অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। আবার এই অংশ টুকুর পার্শ্বে সতীশ পেন্সিলে লিখিয়াছে—"এই সংবাদ যাহাতে কলিকাতার খানকতক খবরের কাগজে বাহির হয় তাহার বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি।"

কলিকাতায় পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে দেখিলাম,

কয়েকখানি সংবাদপত্র সত্য সত্যই আমার সম্বন্ধে প্যারা-গ্রাফটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছে।

(২)

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে যেরূপ ভয় ও ভাবনা হইয়াছিল এখানে আসিয়া কিছুদিনের মধ্যেই সে ভাবনা কাটিয়া গেল। সতীশের আত্মীয়টি ও বন্ধুগণের অনুগ্রহে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই এবং নিজেকেও নিতান্ত অসহায় মনে হইত না।

এদিকে একরূপ নিশ্চিন্ত আছি বটে কিন্তু কাজকর্ম্মের সুবিধার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। প্রায় তিন মাস হইল আলিপুরে বাহির হইতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটাও মোকদ্দমা পাইলাম না, অথচ খরচ যথেষ্ট হইতেছে দেখিয়া সময় সময় অশান্তি বোধ করিতে লাগিলাম। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও সামান্য খরচে সংসার চালা-ইতে পারি না। বৈঠকখানা সাজাইতে কয়েক শত টাকা ব্যয় হইয়াছে; চাকর, দাসী ছাড়া একজন দরোয়ান ও একজন খানসামা রাখিতে হইয়াছে; আমার মত পশারহীন অন্য উকিলদের মত শেয়ারের গাড়িতে কোর্টে যাইতে পারি না—সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে যাতায়াত করি; তাহাছাড়া একজন মুহুরি রাখিতে হইয়াছে। হুহু করিয়া সঞ্চিত অর্থ

ব্যয় হইতেছে, অথচ এক পয়সা উপার্জ্জন নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলে, আমার আলাপী জুনিয়ার উকিলেরা নিজেদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া, আমাকে ব্যস্তবাগীশ বলিয়া ঠাট্টা করে। তাহাদের কেহ এক বৎসরের অধিক আদালতে হাঁটাহাঁটি করিয়াও, এ পর্য্যন্ত একটা টাকাও রোজগার করিতে পারে নাই, কেহ বা নয় মাসের মধ্যে একটা কমিশনের কৃপায় মাত্র চার টাকা পাইয়াছে, আবার কেহ দুই বৎসরে গড়ে তের টাকা করিয়া মাসে উপার্জ্জন করিয়াছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আজকাল প্রায়ই মনে করি, একটা সুবিধামত চাকরী পাইলে লাগিয়া যাই এবং সকালে ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ আসিলে প্রথমেই তাহার বিজ্ঞাপনস্তম্ভ তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, যদি কোন চাকরির সন্ধান পাই।

সতীশ যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইবার কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। উহা যে কাহারও চক্ষে পড়ে নাই তাহা বলিতে পারি না; কারণ, আমি কলিকাতায় আসিয়া বসিতে না বসিতে, কন্যাদায়গ্রস্ত নানা অবস্থার ভদ্রলোকেরা আসিয়া বিবাহের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা প্রলোভন দেখান এবং যাঁহারা

সঙ্গতিহীন, তাঁহারা করুণভাবে নিজেদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন খবরের কাগজে আমার উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া বড় আশায় আমার নিকট আসিয়াছেন, ইত্যাদি। মহাগুরু নিপাতের বৎসরে বিবাহ অসম্ভব—শুনিয়া অনেকেই চলিয়া যান; কিন্তু কেহ কেহ তাহাতেও ছাড়েন না—অশৌচান্তে বিবাহে সম্মতির জন্য জেদ করেন; অনেক কষ্টে তাঁহাদের নিরস্ত করিতে হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে, বৈঠকখানায় ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া, বেশ আরামে একখানা নভেল পড়িতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, দরোয়ান কাহার সহিত বচসা করিতেছে। সে বলিল "বাবু আভি শুতল্ হ্যায়, আপ্ কা কেয়া কাম হ্যায় বাৎলাইয়ে না ?"

মোটা গলায় রুক্ষস্বরে কে বলিল—"কেয়া কাম হ্যায় সো বাবুকো বাৎলায়েঙ্গে, তোম্ খবর দেওগে ইয়া নেহি ?" তাহার সতেজ কথাবার্ত্তায় দরোয়ান নরম হইয়া একটু বিনীত ভাবেই বলিল—"হামারা কসুর নেহি হ্যায় বাবুজি। আদালৎকা কুছ কাম রহেনেসে বাবুকো খবর দেনে শক্তা হ্যায়।" সে, ব্যক্তি অসহিষ্ণুভাবে বলিল—"হাঁ হাঁ, ওহি কাম হ্যায়, বাবুকো কহো।"

আমি স্পষ্টই বুঝিলাম, এ ব্যক্তি দালাল বা প্রার্থী নহে;

এবং ইহাও মনে হইল, সে ধরণের লোক রাত্রিকালে আসে না। তাড়াতাড়ি ফরাস হইতে উঠিয়া একখানা চেয়ারে যাইয়া বসিলাম এবং একখণ্ড "এলাহাবাদ-ল-রিপোর্ট" লইয়া লাল-নীল পেন্সিল হস্তে মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলাম।

দরোয়ান খবর দিতে আসিলে, আগন্তুক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া স্মিতমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতেই আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম. মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং মনের মধ্যে একটা নৈরাশ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া বুঝিলাম যে মক্কেল হইলেও, তাহার নিকট আশা করিবার বিশেষ কিছু নাই।

আগন্তুকের পরিধানে একখানা মলিন কোরা কাপড়, হাঁটুর নীচে নামে নাই; গায়ে পুরাতন ও জীর্ণ একটা কাল-রঙের কোট, তাহার পাঁচটা বোতাম পাঁচ রকমের এবং সেলাই খুলিয়া যাওয়ায় পকেটের কিয়দংশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে; হ্যারিসন রোডের ফুটপাথে উপবিষ্ট পুরাতন কাপড়ওয়ালাদের নিকট যেরূপ কম্ফর্টার দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একটা কম্ফর্টার উড়ানির পরিবর্ত্তে গলায় ঝোলান; এবং ধূলি ধূসরিত পদদ্বয়ে

পেনেলার জুতা,—তাহা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট ছিঁড়িয়া যাওয়ায় আঙুল বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এই লোকটা দরোয়ানের সহিত লাট-সাহেবের মত চোট পাট করিতেছিল! লোকটা আবার হাত বাড়াইয়া, আমার সহিত শেকহাণ্ড্ করিতে আসিল! আস্পর্দ্ধা কম নয়! মুহূর্ত্তে আমার মন তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল; আমি বিরক্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি চান আপনি?"

"বসতে অনুমতি করলে, বোধ হয়, মশায়ের খুব বেশী মানের লাঘব্ হবে না"—বলিয়া আগন্তুক জুতা খুলিয়া, ধূলা-পায়ে সেই ফরাসের উপর দিয়া যাইয়া, অম্লান-বদনে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল—"আঃ, একটু তামাকের হুকুম করুন।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। দারো-য়ানের সহিত তাহার কথাবার্ত্তার ধরন শুনিয়া লোকটার সম্বন্ধে আমার মনে এক রকম ধারণা হইয়াছিল, এবং তাহার কাপড়-চোপড় সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের দেখিয়াই, বোধ হয়, আমার নজর প্রথমটা তাহার সাজসজ্জার দিকেই ছিল—মানুষটাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, লোকটার পোষাকের সহিত চেহারার সামঞ্জস্য নাই; শরীর দারিদ্র্যসূচক নহে, বেশ পরিপুষ্ট ও সবল। আরও

দেখিলাম, তাহার চক্ষু দুটি অত্যুজ্জ্বল; কিন্তু অস্থির ও দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ;—মনে হয়, যেন অন্তস্থল ভেদ করিতেছে।

আমি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার পরিচয় জানিতে পারি কি?"

"পরিচয় দেবার সময় হলেই পরিচয় দেব, হীরেন্দ্র বাবু, সে জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই।"

লোকটা যেই হউক, তাহার লম্বা লম্বা কথা শুনিয়া আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল; বলিলাম—"এক রকম জোর করেই, আমার বিনা-অনুমতিতে, ঘরে ঢুকে বেশ আরাম করে বসে, আমার সময় নষ্ট কর্ছেন; অথচ নিজের পরিচয় দেবেন না—এ মন্দ কথা নয়! এখন কি জন্যে এসেছেন, চট্‌পট্‌ করে বলে ফেলুন; আমার যথেষ্ট কাজ আছে।"

"আপনার যে কত কাজ, তা ভাল করে না জান্‌লে আপনার কাছে আসতুম না। রাগ করবেন না, হীরেন্দ্রবাবু; আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যে সত্য কথাই বলছি, তা আপনি মনে মনে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। এখন কাজের কথা বলা যাক্‌। আমি, আর আমার দুজন বন্ধু, একটি গুরুতর কাজে ব্রতী হয়েছি; কি কাজ, তার সঙ্গে আপনার কি সংশ্রব, অথবা আপনাকে সে সম্বন্ধে কি কর্‌তে হবে, এসব কথা এখন বল্‌তে পার্‌ব না। আপাততঃ আপনাকে সামান্য

একটি প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে; আমার উপর বিশ্বাস করে, সে প্রতিজ্ঞাটি কর্‌তে পারেন—ভালই; না হলে, আমাকে অন্যত্র যেতে হবে।"

লোকটি যেরূপ সহজভাবে ও গম্ভীর মুখে এই কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমার একটু কৌতুহল হইল বটে; কিন্তু নিতান্ত দৈন্যদশাগ্রস্ত লোকের মুখে এই ধরণের কথা এরূপ বিসদৃশ শুনাইল, যে আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"আপনি যে ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের পত্তন কর্‌লেন দেখ্‌ছি। এ গুপ্ত রহস্যের মূলে কি কিছু আছে মশাই! আকাশে খুন, বা পিশাচী বেদৌরা, কিম্বা বৈঠকখানায় বুজরুকি?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, লোকটি বলিল—"ঠাট্টা কর্‌বেন্‌ না, হীরেন্দ্রবাবু। আমি আগেই আপনাকে বলেছি, যে কাজের সূত্রে আপনার কাছে এসেছি, সেটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা আপনিই ভেবে দেখুন দেখি, আপনি কি রকম প্রস্তাব করছেন! একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক এসে যদি আপনাকে একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কাজের সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা করতে বলে, তা হলে আপনি কি বলেন?"

"আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারিনি। কাজটার

সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলতে পারব না বটে কিন্তু আপনাকে কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তা বলছি। আজ রাত্রে ঘণ্টা দু-একের জন্যে আমার সঙ্গে কোন জায়গায় যাবেন, সেখানে সেই কাজ সম্বন্ধে সমস্ত জানতে পারবেন, আর সে বিষয়ে আপনাকে কি ভার নিতে হবে, তাও শুনতে পাবেন। সে ভার নিতে আপনি রাজি না হন, কোন ক্ষতি নেই। এখন কেবল এইটুকু প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হল, সে কথা কাউকে বলবেন না; আর যে কাজের কথা আপনাকে বলা হবে, তার ভার নিতে যদি রাজি না হন, তা হলে ব্যাপারটা আপনি একেবারে ভুলে যাবেন। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে বলছি, যেখানে যেতে বলছি সেখানে গেলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না; আর একথাও বলছি আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি, সেটা কোন হীন বা গর্হিত কাজ নয়, তাতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই?"

আমার মন বিলক্ষণ নরম হইয়া আসিল; বলিলাম—"ধরুন আপনাদের কাজের ভার নিলুম; তাতে আমার লাভ কি হবে?"

"লাভালাভের কথা সেখানে গেলেই শুনতে পাবেন।"

"আপনি যে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন, তা না হয় করলুম; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা যে আমি রক্ষা করব, তা কি করে জানলেন?"

"নবীনকৃষ্ণ রায়ের সন্তান কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনাদের যে কোন দুরভিসন্ধি নেই তা কি করে জানব?"

"কি দুরভিসন্ধি থাকতে পারে, নিজেই মনে করে দেখুন না। আপনি কিছু গয়নাগাঁটি পরে যাবেন না; মনে ভয় হয়, একটা পয়সাও সঙ্গে নেবেন না; আপনার সব চেয়ে পুরাণ ছেঁড়া যে পোষাক তাই পরে যাবেন। আর আপনাকে ধরে রেখে যে বলব, এত হাজার টাকা দাও, তবে ছেড়ে দেব, সে সব দিন যে বহুকাল চলে গেছে, তা বোধ হয় আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

আমি শেষ প্রশ্ন করিলাম—"সব স্বীকার করলুম, কিন্তু আপনার কথায় বিশ্বাস করে, এই রাত্রিকালে কষ্ট করে, একটা অবিশ্বাস্য অসম্ভব ব্যাপারের উপলক্ষে অজানা জায়গায় কেন যাব? আপনি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত—কেবল তাই নয়, আপনার এমন কিছু নেই, যাতে করে আপনার উপর সামান্য বিশ্বাসও হতে পারে।" ইহা বলিয়া তাহার সাজসজ্জার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলাম।

লোকটি তাকিয়া ছাড়িয়া বসিয়া বলিল—"ওঃ! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। আপনি যে মানুষের উপরটাই দেখেন, যাকে

পরমহংসদেব "খোসাটা" বলতেন, তাই দেখে লোকের মূল্য ঠিক করেন, তা বুঝতে পারিনি। আপনার কথা যে রকম শুনেছি, তাতে মনে করেছিলুম, আপনার অন্তর্দৃষ্টি আছে; কিন্তু এখন দেখছি, আমার ধারণা ভুল। যা হোক, আপনি যে রকম প্রমাণ চান, তাই দিচ্ছি এই নিন"—বলিয়া ভদ্র লোকটি পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল, তাহার কতকগুলা ফরাসের উপর পড়িল, কতক মেঝেয়, কতক টেবিলের উপর, দু-এক খানা পাপোষের উপর এবং একখানা পিক্‌দানির মধ্যে পড়িল। টেবিলের উপর যে কয়খানা কাগজ পড়িয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া লইয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—সব কয়খানা হাজার টাকার নোট!

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"এই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিদেবটি কে?" কিছু পরে সযত্নে সব কয়খানা নোট কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম—অধিকাংশই হাজার টাকার, খান কতক পাঁচশো ও একশো টাকার, —মোট এগার হাজার ছয়শো টাকার নোট।

নোটের তাড়াটি ভদ্রলোকের নিকট ফিরাইয়া দিতে গেলে, তিনি হাত নাড়িয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—"আপনাকে নিয়ে যাবার মূলে যে আমার কোন খারাপ মৎলব নেই, তার জামিন-স্বরূপ ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন।"

আমি বলিলাম—"আমি তো পাগল হয়নি, শেষ কালে এই নিয়ে আমার হাতে দড়ি পড়ুক !"

ভদ্রলোকটী হাসিয়া বলিলেন—"এখনও সন্দেহ ? উঃ ! উকিলের কি মন ! চোর-ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে কারবার করে, উকিল-দেরও মনের গতি তাদের মত হয়ে যায়। চোর ডাকাতেরা কি রকম সন্দিগ্ধ চিত্ত তা জানেন তো ?

"Suspicion always haunts the guilty minds. The thief doth fear in each bush an officer."

ভদ্রলোকটি অতি সুন্দর ভাবে এই দুই ছত্র আবৃত্তি করি-লেন। নোটের তাড়া দেখার পর আমার মনে যে সন্দেহের ছায়া অবশিষ্ট ছিল, সেক্সপিয়ার হইতে এই কোটেশনে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিলাম—"নোটের কোন দরকার নেই, আপনার কথায় আর আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।"

কিছুমাত্র আহ্লাদ বা সন্তুষ্টির ভাব না দেখাইয়া ভদ্রলোক অতি পরিষ্কার ইংরাজিতে বলিলেন, Right ; but think over it again and if there is the slightest doubt or hesitation in your mind, I wouldn't advise you to come.

( বেশ ; কিন্তু এ বিষয়ে আপনি আবার ভাবিয়া দেখুন,

যদি আপনার মনে একটুও সন্দেহ বা ইতঃস্ততের ভাব থাকে তাহা হইলে আমি আপনাকে আসিতে বলি না। )

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম যে, আমি যখন কথা দিয়াছি তখন আর পিছাইব না। তখন তিনি স্থির করিলেন, আমি রাত্রি এগারটার সময় বৃজিতলার মোড়ে উপস্থিত থাকিব ; তিনি সেখান হইতে আমাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন।

ভদ্রলোকটি বিদায় গ্রহণ করিলে, আমি বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। এই ভদ্রলোকটি এবং তাঁহার উল্লিখিত বাবু দুইটি কে ? এরূপ কি কার্য্য হইতে পারে, যাহার জন্য তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এত ব্যগ্র, অথচ যাহা অতীব গোপনীয় ? আমাকেই বা ইহাদের কি প্রয়োজন ? একবার চকিতের ন্যায় মনে হইল ইহারা 'এনার্কিষ্ট' নয়তো ! এই কথা মনে হইতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল ; কিন্তু আবার তখনই মনে হইল ভদ্রলোকটি বলিয়াছেন যে, কার্য্যটি কোনরূপ দূষনীয় নহে। এ সকল প্রশ্নের কোন রকম সন্তোষ-জনক জবাব মনে আসিল না, কৌতুহলের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম এবং দশটা না বাজিতেই এক গাছা মোটা লাঠি হস্তে বাহির হইয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য যতদূর সম্ভব সামান্য কাপড় চোপড় পরিয়াছিলাম, ঘড়িটা পর্য্যন্ত সঙ্গে লই নাই ; সম্বলের মধ্যে ট্রাম ভাড়ার জন্য ছয় আনা পয়সা পকেটে ছিল।

( ৩ )

এগারটার অনেক পূর্ব্বে বৃজিতলার মোড়ে পৌঁছিলাম, সুতরাং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। পায়চারি করিতে করিতে দেখিলাম নিকটস্থ থানা হইতে একজন পাহারওয়ালা আমার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম ; মনে হইতে লাগিল নিশ্চয়ই সময় উত্তীর্ণ হইয়া-গিয়াছে , এখনও কেহ যখন আসিল না, তখন ব্যাপারটা সমস্তই ভূয়া। ইতি মধ্যে পাহারওয়ালা একবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেল. আমি কেন পায়চারি করিতেছি।

অবশেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ি ফিরিব ফিরিব মনে করিতেছি এমন সময় একখানা মোটর গাড়ি আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল ;—আরোহী ডাকিলেন "হীরেন্দ্রবাবু !" গাড়ির ভিতর গ্যাসের আলো পড়ায় চিনিলাম সেই ভদ্রলোকটিই বটে ; কিন্তু এখন বেশ ভূষায় কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! গায়ে বুটিদার সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিনের পাঞ্জাবী, তাহার উপর জরির পাড়ওয়ালা সিল্কের চাদর, পরিধানে ঢাকাই ফুলপাড় ধুতি, গলায় মোটা গার্ড চেন, পায়ে পম্প জুতা ; আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে আঙ্গুলে তিন চারিটী হীরার আংটি গ্যাসের আলোতে ঝলমল করিয়া উঠিল।

আমি গাড়িতে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিতেই গাড়ি ধর্ম্মতলার

দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন তো হীরেন্দ্রবাবু! সময়ের মূল্য আপনি জানেন দেখে বড় সুখী হলুম। আপনি চুরুট খান?" বলিয়া রূপার সিগার কেস্ খুলিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি বলিলাম "thanks, আমি চুরুট খাই না।"

"বেশ বেশ, এই রকম অনাসক্ত লোকই আমরা চাই।" বলিয়া তিনি একটা ছোট কৌটা হইতে মোমের দেয়াশালাই বাহির করিয়া সশব্দে জ্বালিয়া একটা চুরুট ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধরাইলেন আমি সেই সুযোগে দেখিলাম তাঁহার হাতের আংটী-গুলিতে বড় বড় হীরা ও পান্না বসান।

ফুৎকারে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "আপনাকে সব রকমে বাজিয়ে দেখলুম, আপনি খাঁটি মানুষ বটে। আমার তো আপনাকে খুব পছন্দ হ'য়েছে এখন সাতকড়ি আর নকড়ি বাবুর পছন্দ হ'লেই হয়।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "আপনাদের ভিতর সাতকড়িও আছেন, আবার নকড়িও আছেন? বেশ মিলেছে তো!"

ভদ্রলোকটি বলিলেন "ও আমাদের নিজেদের তৈরি নাম। এ ব্যাপারের মূলে আমরা তিন বন্ধু আছি, তা আগেই বলেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের তিন জনেরই কিছু কিছু সংস্থান আছে, অর্থাৎ আপনারা যাকে বড়লোক বলেন আমরা তাই। তবে

তিন জনেরই টাকাকড়ি সমান নয়, যথেষ্ট তারতম্য আছে; আমারা সেই হিসাবেই নিজেদের নাম রেখেছি। যাঁর টাকাকড়ি সব চেয়ে বেশী তাঁর নাম নকড়ি, যাঁর তার চেয়ে কম তাঁর নাম সাতকড়ি, আর আমিই তিন জনের ভিতর সব চেয়ে গরীব, তাই আমার নাম দুকড়ি। আপনি আমাকে এই নামেই ডাকবেন।"

ও বাবা! ইনি যদি সর্ব্বাপেক্ষা গরীব হন, তাহা হইলে না জানি সাতকড়িবাবু ও নকড়িবাবু কি রকম! এই তিনজন ধনীর কি করিয়া যোগাযোগ হইল তাহা জানিতে অত্যন্ত কৌতুহল হওয়ায় দুকড়িবাবুকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম এ বিষয়ে আমার কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি না।

দুকড়ি বাবু বলিলেন, "মোটামুটি বলতে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আপনার মনে আছে তো যে, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন বা না দিন, কোন কথা কাউকে না বলতে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?"

আমি "খুব আছে" বলিলে তিনি কহিলেন "আমাদের তিন জনের যোগাযোগ খুব স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। আসল কথা কি জানেন হীরেন্দ্রবাবু, যখন ভগবানের কোন বিষয়ে একটা উদ্দেশ্য থাকে, তখন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে যে যোগাযোগ দরকার, তা আপনিই ঘটে যায়। নকড়ি

বাবু একজন বিখ্যাত কারবারি লোক, লক্ষ্মীর বরপুত্র; সাতকড়ি বাবু একজন স্বনামধন্য এটর্ণি, গভর্ণমেণ্টে খুব খাতির। এঁদের তুলনায় আমি অতি সামান্য লোক; ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়াটে একটু মোটা মাইনের চাকরি করি-মাত্র, নকড়ি ও সাতকড়ি বাবুর সঙ্গে কার্য্য সূত্রেই আলাপ। আমার এমন অর্থবল নাই, যাতে এঁদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগ দিই; কিন্তু বছর দুই আগে ডার্বি সুইপে কিছু টাকা পেয়েছিলুম; সেই পুঁজির জোরেই এঁদের সঙ্গে একাজে যোগ দিতে পেরেছি। আমার থাকবার মধ্যে একটা মেয়ে—বলিতে বলিতে তাঁহার গলাটা ধরিয়া আসিল, তা যা মাইনে পাই, তা থেকে তার একটা হিল্লে করে দিতে পারব। মাঝ থেকে ভগবান কতকগুলো টাকা পাইয়ে দিলেন, তার কতকটা না হয় সৎকাজেই খরচ করি।"

নকড়ি বাবু ও সাতকড়ি বাবুর মত ধনী লোকের সহিত একত্র কার্য্য করিব, ইহা সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। আনন্দে আমার মন নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু ক্ষণেক পরেই আবার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমার এমন কি গুণ আছে যাহা দেখিয়া ইহাঁরা সকলেই আমাকে মনোনীত করিবেন। দুকড়ি বাবু না হয় আমার পক্ষে আছেন; কিন্তু সাতকড়ি ও নকড়ি বাবু যে আমাকে পছন্দ করবেন তার স্থিরতা কি?

আমার আশঙ্কার কথা শুনিয়া দুকড়িবাবু বলিলেন, "আমি যখন পছন্দ করেছি তখন সাতকড়িবাবু বোধ হয় অমত করবেন না, কিন্তু নকড়িবাবুর সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। তিনি লোক খুব ভাল কিন্তু একটু ছিট আছে। এদিকে সৎকাজে মুক্তহস্ত অথচ ভারি দৃষ্টিকৃপণ।"

ইহার পর কথাবার্ত্তা মন্দিভূত হইয়া আসিল। কোথায় যাইতেছি এতক্ষণ সে বিষয়ে আমার হুঁস ছিল না এবং বাহিরে তাকাইয়াও দেখি নাই; কিন্তু মনে হইল যেন আমরা প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া দুই ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট বাড়ির মধ্যস্থিত রাস্তা দিয়া আসিয়াছি। এখন জানলা দিয়া দেখিলাম একটা প্রশস্ত রাস্তা দিয়া গাড়িখানা নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে, রাস্তায় ট্রামের থাম ও তার রহিয়াছে। একটা মোড় পার হইলাম; তাহার মধ্যস্থলে তিন চারিটা ডালওয়ালা একটা গ্যাসের থাম লক্ষ্য করিলাম এবং মিনিট খানেক পরেই বোধ হইল, একটা ছোট পুলের উপর দিয়া গেলাম। এমন সময় দুকড়িবাবু "মাপ ক'রবেন" বলিয়া জানালার পরদা টানিয়া দিলে আরও সাত-আট মিনিট পরে ক্ষণেকের জন্য গাড়ী থামিল; একটা গেট খোলার শব্দ পাইলাম। আরও কিছুদূর যাইয়া গাড়ি আবার থামিল, গাড়ির দরজা খুলিয়া গেল এবং "আসুন হীরেন্দ্রবাবু" বলিয়া দুকড়িবাবু নামিয়া পড়িলেন।

আমরা নামিলাম একটা গাড়ি বারান্দায়। সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই লাল রঙের সৈনিক বেশধারী, কর্ণ সংযুক্ত শ্বেত শ্মশ্রু, প্রশস্ত বক্ষে তিন চারিটা পদক বিলম্বিত একজন শিখ দরোয়ান টুল হইতে উঠিয়া সম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। পার্শ্বের দিকে একটা বারান্দা দিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ছুকড়িবাবু অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ঘরটি আফিস ঘর বলিয়া বোধ হইল। গৃহ সজ্জায় বিশেষত্ব কিছুই নাই। ঘরের মধ্যস্থলে বনাত মোড়া একটা টেবিল তাহার উপর লিখিবার সরঞ্জাম ও কাগজপত্র রহিয়াছে; টেবিলের চারিদিকে খানকতক চেয়ার, মোটা মোটা বই ভরা একটা বুক্‌কেস্ ও টেবিলের উর্দ্ধে একটা ঝাড়ে কয়েকটা বাতি জ্বলিতেছে। এই সকল দেখিতেছি এমন সময় দরজার পরদা সরাইয়া ছুকড়িবাবু ও তাঁহার পশ্চাতে সাহেবী পরিচ্ছদধারী একজন প্রৌঢ় এবং চোগা চাপকান পরিহিত একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন।

ছুকড়িবাবু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"সাতকড়িবাবু, ইনিই হীরেন্দ্রবাবু।" সাহেবী পোষাক পরিহিত ভদ্রলোকটী অগ্রসর হইয়া হাস্যমুখে আমার সহিত শেকহ্যাণ্ড্ করিতে করিতে বলিলেন—"So glad to see you. We have been

anxiously waiting for you. We bid you a warm welcome, my young friend." (আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমরা আপনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম। যুবক বন্ধু, আপনাকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।) এই কয়টি কথার সরল ভঙ্গী ও অমায়িক ভাবে আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করিল।

চোগাচাপকান পরিহিত তৃতীয় ভদ্রলোকটী একটু পশ্চাতের দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার দিকে ফিরিয়া সাতকড়ি বাবু বলিলেন "আসুন নকড়ি বাবু, হীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন।" নকড়িবাবু কোন কথা না বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। লোকটিকে আমার আদৌ ভাল লাগিল না, তাঁহার মুখে যেন এক পোঁচ বিরক্তি মাখান।

সকলে চেয়ারে উপবেশন করিলে সাতকড়ি বাবু বলিলেন, "দুকড়ি বাবুর এঁকে পছন্দ হয়েছে, তাই নিয়ে এসেছেন; এঁকে দেখে আমারও পছন্দ হয়েছে; এখন নকড়ি বাবু মত দিলেই হয়। কি বলেন নকড়ি বাবু, তাহলে কাজের কথা আরম্ভ করি?" নকড়ি বাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলে সাতকড়ি বাবু বলিতে লাগিলেন:—

"আর দিনকতক পরেই কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়া গবর্ণ-

মেন্ট চিরকালের জন্য উঠে যাবে। বাবুদের দল দায়ে পড়ে যাই বলুন, এর ফলে যে বাঙ্গালীদের ভয়ানক ক্ষতি হবে, তার কোন সন্দেহ নাই। যে ডেস্‌প্যাচে দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে যাবার কথা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীর কাছে প্রস্তাব করেছেন, তাতে তাঁরা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কলকাতায় থাকার জন্যে বাঙ্গালীদের Polital influence ওর নাম কি—রাজ-নৈতিক প্রভাবের অন্যায় রকম বৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের এই influencc ভারতের অন্য জাতিদের পক্ষে খারাপ হলেও আমাদের পক্ষে একটা অমূল্য লাভ। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট দিল্লীতে গেলে আমাদের এই অমূল্য রত্নটুকু কর্পূরের মত উবে যাবে। আমাদের সকলের উচিত সেইটা যাতে না হয়, সে সম্বন্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করা। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাঙ্গালীদের একখানা ভাল খবরের কাগজ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করা। এটার যে খুব দরকার তা মুসলমান সমাজের নেতারা বুঝতে পেরে তাঁদের Comrade কাগজ দিল্লীতে তুলে নিয়ে যাবার বন্দো-বস্ত করেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের কেউ এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। আপনি বুঝতে পারছেন, এই কাজটী যার দ্বারা সম্পন্ন হবে, সে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মহৎ উপকার করবে। কিন্তু কাজটা তো বড় সোজা নয়, যা

তা একখানা কাগজ বার করলে হবে না; তাতে আরও খারাপ হবে। বাঙ্গালীর নাম রাখতে পারে, এমন কাগজ হওয়া দরকার; একেবারে up-to-date হবে; কাগজ ছাপা first class হবে, ইণ্ডিয়ার সমস্ত বড় জায়গায়, এসিয়ার বড় বড় সহরে, আর লণ্ডনে রীতিমত correspondent থাকবে, নির্ভীক স্বাধীন মত প্রকাশ করতে হবে, অথচ গভর্ণমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে যাবে না; and above all মোটা মাইনের সাহেব রিপোর্টার পাচ সাত জন রাখতে হবে; আর editing staff উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোক নিয়ে তৈয়ারি করতে হবে; ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে ছোকরা গ্রাজুয়েট এডিটার রাখলে চলবে না।"

আমি বলিলাম, "আমাদের পক্ষে ওরকম উচুদরের কাগজ বা'র করবার ইচ্ছা নিতান্তই দুরাশা। ওরকম কাগজ বা'র করতে গেলে অগাধ টাকার দরকার। তত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?"

সাতকড়ি বাবু বলিলেন, "সেই কথাই হচ্ছে। দিল্লীতে বাঙ্গালীদের একখানা কাগজ বার করবার জন্যে নকড়ি বাবু, ছকড়ি বাবু, আর আমি এই তিন জনে মিলে পাঁচলাখ টাকা খরচ করতে রাজি আছি। দুঃখের বিষয় আমরা তিন জন একাজে প্রকাশ্য ভাবে হাত দিতে পারব না।

খালি তাই নয়, কাগজখানার সঙ্গে যে আমাদের কোন সম্বন্ধ আছে, তা আমরা চারজন ছাড়া জনপ্রাণীও যেন না জান্তে পারে।"

আমি বলিলাম,—"এত লুকোচুরির কারণ তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"কারণ না থাকলে কি আর সখ করে লুকোচুরি কর্‌ছি? কথাটা কি জানেন? দুকড়ি বাবু অনেক গোপন খবর এনে দেবেন, সে সব Sensational খবর পেলে বড় বড় কাগজ-ওয়ালারাও দু'হাত তুলে নাচতে থাকে; সে রকম খবর আমরা প্রায়ই বার ক'রব; এতেই আমরা অন্য সব কাগজের উপর টেক্কা দেব। এ রকম খবর দু'একটা বেরুলেই মহা সোর-গোল পড়ে যাবে, কাজেই দুকড়ি বাবুর সঙ্গে কাগজখানার সংশ্রব লুকিয়ে রাখতে হবে। আমার আর নকাড় বাবুর সঙ্গে দুকড়ি বাবুর খুব দহরম-মহরম, তা অনেকেই জানে, সুতরাং আমাদেরও কাগজখানার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলে চল্‌বে না। এই জন্যই আমরা এত সাবধানে চল্‌ছি; লুকিয়ে ছদ্ম নাম নিয়ে এ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েছি, আর এ সমস্ত কথা গোপন রাখতে আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছি।"

. সাতকড়ি বাবু বলিতে লাগিলেন,—"এখন এ কাজের ভার কার উপর দেওয়া যায়, তাই আমাদের মহা সমস্যার বিষয়

হ'য়েছিল। আমরা নিজেরা তো কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না, এতটা টাকা বিশ্বাস ক'রে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। যে নিজে ধনী, তাকেই এত টাকা দিয়ে বিশ্বাস করা যেতে পারে সুতরাং যার উপর এ কাজের ভার দেব সে ধনী হবে; তাকে অন্য সমস্ত কাজ ফেলে এই ব্যাপারে নিজেকে উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে; আর চিরকাল দিল্লীতে থাক্‌তে হবে। তার নিজের পরিশ্রম করবার এবং অন্য লোককে খাটাবার ক্ষমতা থাকা চাই। সে উচ্চশিক্ষিত হবে, আর খবরের কাগজ চালান সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা থাকবে। এতগুলি গুণ একত্র পাওয়া বড় শক্ত। অনেক খোঁজ করে যে দু একটি উপযুক্ত লোকের কথা আমরা জান্‌তে পেরেছি, তাঁরা যে এ ব্যাপারের ভার নেবেন সে আশা নেই। শেষকালে খবরের কাগজে আপনার কথা পড়ে আমাদের বড় মনে লাগলো; আমরা ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে জানলুম খবরের কাগজে আপনার যে বিবরণ বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। দুকড়ি বাবুর মানুষ চেনবার আর লোক বশ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। তাই তাঁকে পাঠিয়েছিলুম; আপনাকে পরখ ক'রে যদি উপযুক্ত মনে করেন তা হ'লে চুপি চুপি এখানে নিয়ে আস্‌তে, যদি আপনি সহজে না আস্‌তে চান তা হ'লে কৌশল ক'রে আন্‌তে। আপনাকে আমাদের মৎলবের যে কথা বল্লুম, তাতেই বুঝতে

পাচ্ছেন এ ব্যাপারটির সম্পূর্ণ ভার আপনার উপর দিতে চাই। এ রকম একখানা খবরের কাগজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হওয়া কত গৌরবের বিষয়, তা আর আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনার পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসে পাঁচশো টাকা—"

নকড়ি বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"আমি আপনাদের চার'শ টাকার কথা বলেছিলুম, আবার এক'শ বাড়ান হ'ল কেন?"

ছকড়ি বাবু বলিলেন,—"পাঁচ'শ টাকা অতিরিক্ত নয়। কোন সাহেবি কাগজের ম্যানেজার বা এডিটারের মাইনে পাঁচ'শর কম নয়। আমরা যখন অন্য সব বাবদে সাহেবি কাগজের মত খরচ ক'রছি, তখন এই একটি বিষয়ে টানাটানি ক'রে কি হবে? পাঁচ'শ টাকার কম দিলে হীরেন্দ্র বাবুর প্রতি অবিচার করা হয়।"

আমি বলিলাম,—"না না, এর জন্য আপনাদের কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই, চার'শ টাকাতেই আমার চলে যাবে।"

"এক পয়সাও না নিয়ে আপনার চল্‌তে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না, চার'শ টাকা আমাদের কাগজের ম্যানেজিং এডিটারের উপযুক্ত মাহিনা নয়। নকড়িবাবু আপনি আর এতে অমত কর্‌বেন না।"

নকড়ি বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সাতকড়ি বাবু বলিতে লাগিলেন,—"হীরেন্দ্রবাবু, তা হ'লে আপনি কা'ল থেকেই

লেগে যান। বারুণ কোম্পানী কি জেসপ কোম্পানীর সঙ্গে দেখা ক'রে বিলেত থেকে লিনো টাইপ আর রোটারি মেশিন আনবার অর্ডার দিন; ব'লে দেবেন যেন করাচিতে book করে; এঞ্জিন বোধ হয় বরণ কোম্পানীরাই দিতে পারবে; জন ডিকিনসন্ কোম্পানীর সঙ্গে দেখা ক'রে বিলেত থেকে একেবারে এক বছরের মত কাগজ আনাবার বন্দোবস্ত ক'র্‌-বেন, পাইওনিয়রের সাইজের আট পাতা কাগজ হবে, কিন্তু পাইওনিয়রের মত glazed কাগজ হ'লে হবে না, ষ্টেটসম্যান কি ডেলিনিউসের মত rough surface চাই। এ সবের জন্য কা'ল আপনাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া যাবে। তাতেই বোধ হয় আপাততঃ চলে যাবে, তারপর যেমন যেমন দর-কার হবে টাকা পাবেন। বিলেত থেকে মালগুলা এসে প'ড়লে বাকি সমস্ত টাকাটা পাবেন। হিসেব পত্র রাখা ও চিঠিপত্র লেখার জন্য কা'ল পরশু থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে একজন কেরাণি রাখুন। দুকড়ি বাবু আফিসের কাজে দুই চার দিনের মধ্যে দীল্লি যাবেন। তিনি এলে সকলে পরামর্শ করে কি রকম staff রাখা হবে সেটা ঠিক ক'রে ফেলা যাবে।"

আমি। "রয়টার, আর এসোসিয়েটেড প্রেসের টেলিগ্রাম নিশ্চয়ই নেওয়া হবে, ইণ্ডিয়ান নিউজ এজেন্সিরও নেওয়া হবে

কি ? আর দেশী বিদেশী করেস্‌পণ্ডেণ্টের কি বন্দোবস্ত হবে ?"

সাতকড়িবাবু। "র‍্যাটক্লিফ সাহেব বিলেতের করেস্পণ্ডেণ্ট হবেন, আর কলম্বোতে চিদাম্বরম্ চেটী ব'লে একজন বড় ব্যারিষ্টার সিলোনের করেস্পণ্ডেণ্ট হবেন তা আমি ঠিক ক'রেছি। চায়না, জাপান আর পারসিয়ার খবরের বন্দোবস্ত ক'রতে আপনি রস্তমজির সঙ্গে দেখা ক'রবেন, ঐ সব দেশে ওদের কারবার আছে কি না। রস্তমজি আমাদের নকড়ি বাবুর বুজম্ ফ্রেণ্ড ; নকড়ি বাবুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাবেন। আর ইণ্ডিয়ার ভিতর যেখানে যেখানে করেস্পণ্ডেণ্টের দরকার, তার ভার আমি নিলুম।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাগজের নাম কি হবে, ঠিক ক'রেছেন কি ?"

সাতকড়ি ও দুকড়ি বাবু সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "Bengal Times"

দুকড়ি বাবু বলিলেন—"আমাদের কাগজের মূল policy কি হবে, তা এর পরে আপনাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দেব। আর একটা কথা, আমাদের আসল নাম আর আপনাকে ব'লতে কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু আপাততঃ বলবার কোন দরকার নেই। আপনাকে যে অবিশ্বাস করছি তা নয়, কেবল সাব-

ধানের হিসাবেই নাম ব'লছি না। যদি পরে দরকার হয়, তা হ'লে অবশ্যই আমাদের নাম জানতে পারবেন, তখন আমরা নাম জানতে দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবো না। ইতিমধ্যে আমাদের কোন কথা জানবার দরকার হ'লে নকড়ি গুপ্ত, সাতকড়ি গুপ্ত কি দুকড়ি গুপ্তের নামে জেনারেল পোষ্ট আফিসের কেয়ারে চিঠি লিখিবেন। তা হ'লে কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে রইল, কালবেলা ২টার সময় আপনার বাসায় গিয়ে টাকা দিয়ে আসব। এখন ওঠা যাক, অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে।"

দুকড়ি বাবু ও আমি উঠিয়া পড়িলাম; সাতকড়ি বাবু উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নকড়ি বাবু তাঁহার বাহু ধরিয়া বসাইয়া নিম্নস্বরে তাঁহাকে কি বলিতে লাগিলেন। সাতকড়ি বাবু সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না না, দরকার কি?" নকড়ি বাবু আবার কি বলিতে লাগিলেন। শেষে সাতকড়ি বাবু বলিলেন,—"শুনুন দুকড়ি বাবু, নকড়ি বাবু আবার কি ব'লছেন। উনি ব'লছেন যে, সমস্ত ভারই হীরেন্দ্র বাবুর উপরে থাকবে, তবে নকড়ি বাবু সুবিধামত মাঝে মাঝে গিয়ে হিসাবপত্র দেখে আসবেন। আমার কিন্তু মনে হয় এতে আমাদের সঙ্গে কাগজখানার সম্পর্ক জানাজানি হ'য়ে যেতে পারে।"

নকড়ি বাবু। "যাতে জানাজানি না হয় সে রকম ভাবেই আমি চ'লব। হাজার হউক হীরেন্দ্রবাবু ছেলেমানুষ।"

আমি : "সে তো নিশ্চয়। আপনিও যদি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে শুনে আসেন, তাহ'লে আমি সৌভাগ্য মনে ক'র্ব।"

সাতকড়িবাবু। নকড়ি বাবু আর একটা কথা ব'লছেন। উনি ব'ল্ছেন, "হীরেন্দ্র বাবুর হাতে আমারা এত টাকা ছেড়ে দিচ্ছি, ওঁর কাছে কিছু জামিন নেওয়া উচিত।"

ছকড়ি বাবু আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "তাহলে আমি এর ভিতর নেই, আপনারা যা ইচ্ছা করুন।"

সাতকড়ি বাবু অসহায়ভাবে একবার ছকড়িবাবুর দিকে এক-বার নকড়ি বাবুর দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

নকড়ি বাবু ধীরভাবে বলিলেন "হীরেন্দ্রবাবু যদি আমার নিজের ছেলে হ'তেন, তা হ'লেও তাঁর কাছে জামিন চাইতুম্।"

সাতকড়ি বাবু। কত টাকার জামিন নিতে চান আপনি? দশ হাজার, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, এর বেশী তো নয়? এদিকে আমারা যে ওঁর কাছে পাঁচলাখ টাকা ছেড়ে দিচ্ছি। এ রকম জামিন নিয়ে ফল কি?

নকড়ি বাবু। সদাগরি আফিসে যে কেশিয়ারদের কাছ থেকে জামিন নেয়, কেশিয়ারকে যত টাকা ঘাঁটতে হয় তত টাকারই কি জামিন নেয়? শতকরা দশ, পনর, কি কুড়ি

টাকা হিসাবে নেয়, আবার তেমন বিশ্বাসী লোক হ'লে তার চেয়ে কমও নেয়। আমরা ওঁর কাছে নামমাত্র জামিন নিচ্ছি বৈতো নয়, এঁকে পনর হাজার টাকার বেশী দিতে হবে না। কেমন এতে তো আপনাদের কোন আপত্তি নেই ?

ডুকড়ি বাবু। অবশ্য পনর হাজার টাকা একটা কিছুই নয়, কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। জামিনের কথা যখন আগে উঠেনি, আর এঁকে আনবার সময় যখন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি, তখন কি করে ওঁকে জামিনের কথা বলা যেতে পারে ?

নকড়ি বাবু। বেশ, আপনারা যখন জামিন নিতে চাইছেন না, তখন নেবেন না। কিন্তু যে ব্যাপারের গোড়াতেই গলদ্ সে ব্যাপারের সঙ্গে আমি কোন সংশ্রব রাখতে চাই না।

গুরুতর ব্যাপার দাঁড়ায় দেখিয়া আমি বলিলাম "এর জন্য আর এত গোলমাল কেন ? আমি আহ্লাদের সহিত জামিন দেব।"

ডুকড়িবাবু নকড়িবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "জামিন তো নেবেন, কিন্তু টাকার রসিদে আর সিকিউরিটি বণ্ডে তো নকড়ি কি সাতকড়ি নাম চলবে না, আসল নাম দিতে হবে, তার কি ?" একটা কঠিন সমস্যার কথা বলিয়াছেন, এই ভাবে ডুকড়িবাবু মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

নকড়িবাবু। "ওসব কথা না ভেবেই কি জামিনের কথা

তুলিতেছি? টাকাটা সাতকড়ি বাবুর firmএর নামে নেওয়া হবে, বণ্ড সাতকড়িবাবু নিজে তৈরি ক'র্‌বেন, আর সাতকড়ি বাবুর firm, টাকাকড়ি সংঘটিত কোন কাজে হীরেন্দ্রবাবুকে বাহাল করেছেন বলে জামিন নেওয়া হচ্ছে, এই মর্ম্মে বণ্ড তৈরি হবে। দলিলখানাতে খবরের কাগজের কোন উল্লেখ না থাকিলেই হল: এতে হীরেন্দ্রবাবু সাতকড়িবাবুর নাম জান্‌তে পার্‌বেন। তা যখন দরকার, তখন জান্‌লে ক্ষতি নেই।"

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সাতকড়ি ও দুকড়িবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, স্থির হইল আগামী কল্য যে সময় দুকড়ি-বাবু আমাকে টাকা দিতে যাইবেন সে সময় জামিন ও তৎসং-ক্রান্ত দলিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পাকা খবর দিয়া আসিবেন। নকড়ি ও সাতকড়ি বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি দুকড়িবাবুর সঙ্গে মোটরে যাইয়া উঠিলাম।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে দুকড়িবাবু হঠাৎ নিজের দুই হাতের মধ্যে আমার হাতখানা লইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "আমায় মাপ করুন হীরেন্দ্রবাবু; এমন হবে জান্‌লে আমি কখনও আপনাকে আনতুম না, অন্ততঃ আপনাকে জামিনের কথা বলে আনতুম।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এর জন্য আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! খালি জামিনের কথা কেন, আপনি

তো আমার বাসায় কোন কথাই আমাকে বলেন নি। আর জামিনের কথাটা এমন কোন অন্যায় কথা নয়, যার জন্যে আপনাকে মাপ চাইতে হবে।"

"না হীরেন্দ্রবাবু, আমার মনে হচ্ছে আপনি কায়দায় পড়ে জামিন দিতে রাজি হয়েছেন। আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম যে নকড়িবাবু ওকথা তুলিবেন, তা হ'লে আপনার বাসাতেই সে কথার আভাস দিতুম। যা হোক, আমি আপনাকে এই নূতন সর্ত্ত থেকে অব্যাহতি দেব। জামিনের টাকাটা আমিই দিয়ে দেব, ওরা জানবে আপনিই দিলেন।"

আমি বলিলাম, "সেকি কথা? আপনি কেন টাকা দেবেন আর আমিই বা নেব কেন? টাকাকড়ি সংক্রান্ত চাকরি ক'রতে গেলেই জামিন দিতে হয়, আমি সেই হিসাবে দিচ্ছি; আপনি কেন এর জন্যে নিজেকে দায়ী ক'রছেন?"

দুকড়িবাবু ছাড়িবেন না, আমিও শুনিব না; অনেক বাদানুবাদের পর তবে তিনি নিরস্ত হইলেন। এতক্ষণ অন্যদিকে মনোযোগ দিবার অবসর ছিল না; তাহার পর নানা চিন্তায় মন নিবিষ্ট থাকায় কোন্ রাস্তা দিয়া যাইতেছি, সেদিকে খেয়াল ছিল না এবং আমরা যে বাড়িতে গিয়াছিলাম সেটা কাহার বা কোথায়, সে সম্বন্ধে দুকড়িবাবুকে প্রশ্ন করিবার কথাও মনে হয় নাই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, আমরা চৌরঙ্গি ও রসা-

রোড দিয়া বাসায় ফিরিলাম। আমাকে বাসার সম্মুখে নামাইয়া দিয়া, ছকড়িবাবু মোটর লইয়া চলিয়া গেলেন।

( ৪ )

পরদিন বেলা ২টার কিছু পরে, একখানা প্রথম শ্রেণীর ফিটনে দুকড়ি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলাম।

খানসামাকে তামাক দিতে বলিলে দুকড়ি বাবু বলিলেন, "থাক্ হীরেন্দ্র বাবু, আমি বেশীক্ষণ বস্‌তে পারব না। আজ সকালবেলা আফিস থেকে চিঠি পেলুম, আজই আমাকে দিল্লীতে যেতে হবে; আমার গোছগাছ কিছু হয় নি; তাড়াতাড়ি এই কাজ চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরিব। এই নিন আপনার টাকা"—বলিয়া একতাড়া নোট আমার হাতে দিলেন।

গণিয়া দেখিলাম, একশো টাকার দুইশত কেতা নোট। দুকড়ি বাবু বলিলেন, "বিশ হাজার টাকা পেলেন তো? এখন একখানা রসিদ লিখে দিন, না হ'লে নকড়ি বাবু আবার হাঙ্গাম বাঁধাবেন—Fussy old Jew!"

রসিদ লিখিয়া দিতে যাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার কাছে টাকা পেলুম লিখব?"

দুকড়ি বাবু কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ এটর্ণির নাম করিলেন; বুঝিলাম ইনিই সাতকড়ি বাবু। গত রাত্রিতে

দুকড়ি বাবুর মুখে সাতকড়ি বাবুর বিবরণ শুনিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক।

রসিদ লইয়া দুকড়ি বাবু বলিলেন, "জামিনের ব্যাপারটাও আজই চুকিয়ে ফেলা দরকার। কাল নকড়ি বাবু, সাতকড়ি বাবুকে বলে দিয়েছিলেন আগে আপনার কাছে থেকে জামিন নিয়ে, তবে যেন আপনাকে টাকা দেওয়া হয়। তাঁর একথা আমরা গ্রাহ্য করতুম না, ধীরে সুস্থে জামিনের বন্দোবস্ত করতুম; কিন্তু আজই যখন আমাকে দিল্লীতে যেতে হ'চ্ছে, আর কবে ফিরব তার ঠিক নেই, তখন এ বিষয়টা একেবারে মিটিয়ে যাওয়াই ভাল। সকালে আফিসের চিঠি পেয়েই সাতকড়ি বাবুকে বলে পাঠিয়েছিলুম, বণ্ডখানা আর জামিনের টাকাটার জন্যে একখানা রসিদ তৈরি করে রাখ্‌তে। এই নিন্, পড়ে দেখুন।"

পড়িয়া দেখিলাম, দস্তুরমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে লেখা বণ্ড্ এবং সাতকড়ি বাবুর প্রকৃত নাম ও ঠিকানা-ছাপা চিঠির কাগজে টাইপকরা ও সাতকড়ি বাবুর দ্বারা সইকরা পনর হাজার টাকার রসিদ। দলিল খানায় সই করিয়া দিলাম; প্রতিবেশীরা সকলেই নিজ নিজ অফিস-কাছারি চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া, পাড়ার একজন মুদি ও আমার মুহুরীকে সাক্ষী করিতে হইল।

রসিদখানা আমার হস্তে দিয়া এবং দলিলখানা পকেটে লইয়া

. দুকড়ি বাবু উঠিয়া পড়িলেন;—দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাঃ, জামিনের টাকা নিলেন না?"

দুকড়ি বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নাঃ, আপনার সঙ্গে পারবার যো নেই। আমি মৎলব করেছিলুম, যদি টাকার কথাটা আপনার মনে না হয়, তা হলে আমি নিজেই টাকাটা দিয়ে দেব। তা আপনি যখন নাছোড়বান্দা, তখন আর কি করিব? দিন্, টাকাকড়ি কি দেবেন দিন্।"

আমি তখন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর পনর হাজার টাকার একখানা চেক্ লিখিয়া দিলাম। তাহা লইয়া দুকড়ি বাবু প্রস্থান করিলেন।

সেদিন আর কোন কাজকর্ম্ম করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। পরদিন আহারাদি করিয়া সাতকড়ি বাবুর উপদেশমত প্রেসের সরঞ্জাম ইত্যাদি অর্ডার দিতে বাহির হইলাম। দুকড়ি বাবুর প্রদত্ত সমস্ত টাকা সঙ্গে লইলাম;. বায়নার জন্য যাহা দরকার হয় দিব, বাকি টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিব।

কিছু খরচা টাকার দরকার হইতে পারে ভাবিয়া, খান দুই তিন নোট ভাঙ্গাইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে করেন্সি আফিসে উপস্থিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কখনও করেন্সি আফিসের ভিতরে যাই নাই। হলে প্রবেশ করিয়া, একজন মাড়োয়ারিকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার নির্দ্দেশানুসারে একজন কেরাণির নিকট তিনখানা একশো টাকার নোট দিয়া, দশ টাকার নোট ও কিছু টাকা

চাহিলাম। সে আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলায়, আমি কৌতূহলের সহিত সেস্থানের লোকের জনতা ও ঝন্‌ঝন্ শব্দে রাশিরাশি গিনি ও টাকা ওজন করা দেখিতেছি, এমন সময় একজন সার্জ্জেণ্ট আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল "I arrest you." (আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করুচি)।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, আমি সার্জ্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্ষণেক পরে, সে দৃঢ়স্বরে ইংরাজিতে বলিল, "আমার সহিত এস"। ইহাতে আমার চমক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, কি অপরাধে গ্রেপ্তার হইলাম জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় জ্ঞান হইল প্রশস্ত হলটি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং হলের যাবৎ লোক একদৃষ্টে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তখন আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া, সার্জ্জেণ্টের সহিত চলিলাম। লক্ষ্য করিলাম—আমার পশ্চাতে দুইজন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও পিছনে পিছনে চলিল।

একটা ঘরে উপস্থিত হইলে, চেয়ারে উপবিষ্ট একজন সাহেব আমায় নোট তিনখানা দেখাইয়া বলিল, "তুমি জাল নোট চালাইয়াছ! সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাও?"

আমি উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলাম, "জাল নোট! অসম্ভব।"

সাহেব। সম্ভব কি অসম্ভব, সে কথা জিজ্ঞাসা করুছি না। তুমি কিছু কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা কর?

আমি। কার্য্যসূত্রে অন্য অনেক নোটের সঙ্গে এই তিনখানা নোট পাইয়াছি। ইহা যদি সত্যই জাল হয়, আমি তাহা জানিতাম না।

সাহেব। তুমি যে কৈফিয়ৎ দিলে, তাহা সকলেই দিয়া থাকে। আর কিছু বলিবার আছে?

আমি। আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না? যে নোটের সহিত এই তিনখানা নোট পাইয়াছি, সেগুলা আমার সঙ্গেই আছে; এই দেখুন, বলিয়া ভিতরের পকেট হইতে নোটের তাড়াটা বাহির করিয়া সাহেবের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলাম।

সাহেব তাড়াটা তুলিয়া লইয়া প্রত্যেকখানা নোট তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ অন্ধকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "সব-গুলাই জাল!"

( ৫ )

পিতামাতার পুণ্যে অধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল না। পরে শুনিয়াছিলাম, গ্রেপ্তার হইবার সময় ও তাহার পরে, আমার ধরণধারণ দেখিয়া পুলিশ অনুমান করিয়াছিল যে, আমি নির্দ্দোষ। কি সূত্রে আমি নোটগুলা পাইয়াছিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া, পুলিশ যখন আমার বাসা হইতে ডুকড়ির প্রদত্ত পনরহাজার টাকার রসিদখানা লইয়া গিয়া আমার ব্যাঙ্কে যাইয়া জানিতে পারিল যে, সত্য সত্যই পূর্ব্বদিনে আমার

চেক্ ভাঙ্গাইয়া কে পনর হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে; বৃক্ষি-তলার পাহারাওয়ালাকে আমার নিকট আনিলে সে বলিল যে, তিন দিন পূর্ব্বে রাত্রিকালে আমি অনেকক্ষণ বৃক্ষিতলার মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলাম ও তাহার পর একজন বাবু হাওয়া গাড়িতে আসিয়া আমাকে লইয়া যায়; এবং পুলিশ আমার অনুরোধে তিনমাস পূর্ব্বের কয়েকখানি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া যখন আমার পরিচয় জানিতে পারিল, তখন আমার কথায় পুলিশের অনেকটা প্রতীতি জন্মিল। তাহার পর, আমার প্রতিবেশীদের নিকট এবং আলিপুর কোর্টে খোঁজ লইয়া এবং মান্দালে হইতে টেলি-গ্রাফে খবর আনাইয়া, বুঝিতে পারিল যে জালিয়াৎদিগের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। তাহারা আমাকে জামিনে খালাস দিল; সাবধান করিয়া দিল যে, জালিয়াতরা ধরা না পড়া পর্য্যন্ত যেন কোন কথা কাহারও কাছে প্রকাশ না করি।

ছুকড়ি, যে বিশিষ্ট এটর্ণির নাম করিয়া সাতকড়ির পরিচয় দিয়াছিল, পুলিশ ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে, তিনি সত্যসত্য সাতকড়ি নহেন এবং পুলিশ এ বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণও পাইয়াছিল। দেখা গেল, ছুকড়ির প্রদত্ত পনর হাজার টাকার রসিদে যে সহি ছিল, তাহার সহিত এটর্ণি মহাশয়ের সহির কোন সাদৃশ্য নাই এবং তাঁহার আফিসে তাঁহার নাম-ধাম-ছাপা যে চিঠির কাগজ ব্যবহৃত

হয়, তাহা রসিদের কাগজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের; বুঝা গেল যে, রসিদের কাগজখানা জুয়াচোরেরা নিজেরাই ছাপাইয়া লইয়াছিল।

পুলিশের বড়সাহেব হইতে ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত, সকলেই এই তিন ধড়িবাজ জুয়াচোরের অসাধারণ কৌশল ও কার্য্যতৎপরতায় চমৎকৃত হইয়া গেল। পুলিশের বড়সাহেব বলিলেন, তিনি পঁচিশ বৎসর পুলিশে কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু এদেশে যে এরূপ উচ্চশিক্ষিত, চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মবিচারশক্তিসম্পন্ন জুয়াচোর আছে, এ ধারণাই তাঁহার ছিল না।

এই ঘটনার কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একখানা করিয়া বিশিষ্ট ধরণের জাল নোট তদন্তের জন্য পুলিসের হস্তে আসিতেছিল। জাল-নোট সাধারণতঃ অল্প মূল্যেরই হয় এবং তাহাতে প্রায়ই ছোটখাট খুঁত থাকে। এ নোটগুলি উচ্চমূল্যের ও নিখুঁত বলিয়া পুলিসের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, একজন সাহসী ও নিপুণ জালিয়াতের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। আমার নিকট যে জালনোট পাওয়া গিয়াছিল সেগুলাও যে সেই জালিয়াতেরই প্রস্তুত, সে সম্বন্ধে পুলিসের কোন সন্দেহ ছিল না। তাহারা অনুমান করিল যে, ইদানীং পুলিসের অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জাল নোট চালাইবার অত্যন্ত অসুবিধা হওয়ায় জালিয়াতেরা

ভোগ ও দারুণ অর্থনাশের জন্য প্রথম প্রথম যখন বড় কষ্ট হইত, তখন এই মনে করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম যে, এই ব্যাপার সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইত যদি সে সময় মা জগন্নাথক্ষেত্রে না থাকিতেন;—আমার গ্রেপ্তার ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতেন। তিনি যে এ বিষয়ে কিছু জানিলেন না, তাঁহাকে যে হারাইলাম না; ইহাই পরম লাভ মনে করিয়া শান্তিলাভ করিতাম।

এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই; কারণ, এই ঘটনার ফলে, আমার নাম সাধারণের নিকট পরিচয় হইয়া গেল। আমার পিতা যে একজন বড়লোক ও প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন, তাহা সকলে জানিতে পারিল এবং আমার অর্থের কথাটা একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই প্রচারিত হইল। ইহার ফলও ফলিল,—মক্কেলের আর অভাব রহিল না। ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে যে "অমঙ্গল হইতেই মঙ্গলের সৃষ্টি হয়"—উপস্থিতক্ষেত্রে তাহা ঠিক ফলিয়া গেল! আমারও খুব শিক্ষা হইল।

# যদু মাষ্টার

সে অনেকদিনের কথা। বাড়িশুদ্ধ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলাম; আমাদের ভাটপাড়ার চটকলের ডাক্তার কুইনাইন ও আর্সেনিকের শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে বলিলেন যে, বায়ুপরিবর্ত্তন না করিলে রোগ আরাম হইবে না। শিয়ালদার ট্রাফিক আফিসে কর্ম্ম করি। আমাদের মুনিব পি, ডি, বারক্লে সাহেবের সুপারিসে, এবং ম্যানেজার আফিসের বাবুদের খোসামোদ করিয়া, ফরেণ রেলের দুষ্প্রাপ্য পাস্ একখানি সংগ্রহ করিয়া দুই মাসের ছুটিতে কাশী যাত্রা করিলাম। দুইটি শিশুসন্তানসহ স্ত্রীও সঙ্গে চলিলেন।

তাহার পূর্ব্বে আমার পশ্চিমের দৌড় হুগলি পর্য্যন্ত ছিল; আমার স্ত্রীও তাঁহার জন্মস্থান নিমতা ও আমাদের ভাটপাড়া গ্রাম ছাড়া অন্য কোন দেশ দেখেন নাই; কেবল জুবিলীর সময়, আলো ও আতসবাজি দেখিতে দুই দিনের জন্য একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের নিকট কাশী প্রকৃতই ভূস্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। কাশীর ছোটবড় সকল ব্যাপারই—নূতন প্রকারের বাড়ীঘর ও লোকজন, নানা ধরণের সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম, দেবালয়ে ব্রহ্মচারিগণের পাঠাভ্যাস, বাবা বিশ্বনাথের

রোমাঞ্চকারী আরতি, অসংখ্য ছোটবড় পীঠস্থান, গঙ্গাতীরে প্রকাণ্ড পাথরের প্রাসাদ ও ঘাটের শ্রেণী, সারি-সারি দোকানে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার, নির্বিবাদী মহাকায় ষাঁড়ের দল, দুর্গাবাড়ীতে বানরের আড্ডা, সঙ্কীর্ণ, আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি—সমস্তই আমাদের নিকট নূতন, অদ্ভুত ও মনোহর বোধ হইত। আর নানাবিধ তরিতরকারী, ফলমূল, মাছ ও মিষ্টান্নাদি আমাদের দেশের অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট ও সস্তা—তাহা আমাদের নিকট নিত্যই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের জ্বর কোথায় পলাইল এবং দেখিতে দেখিতে দেহে যেন নব স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তির জোয়ার আসিল।

কেদারঘাটের নিকটে বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম। দোতলার উপর ক্ষুদ্র দুইটী ঘর ও তাহার কোলে রাস্তার উপর ছোট একটি বারান্দা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে বাসায় ফিরিলে, ছেলেমেয়ে দুটিকে ঘুম পাড়াইয়া এই বারান্দায় বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতাম, এবং প্রায়ই জল্পনা করিতাম যে, এবার হইতে সুবিধা পাইলেই কাশীতে আসিতে হইবে।

একদিন দুপুরবেলা গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া গা মুছিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কিছুদূরে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া কটমটু করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, লোকটির

চেহারা অত্যন্ত শ্রীহীন, কাপড়চোপড় ময়লা ও ছেঁড়া, চুল ও দাড়িগোঁফ দীর্ঘ ও রুক্ষ এবং শরীর শীর্ণ। চোখের শাঁস বাহির করিয়া সেইরূপ চাহনি পূর্ব্বে কোথা দেখিয়াছি এই কথা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভাবিতেছি, এমন সময় লোকটি দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া অস্বাভাবিক মোটা গলায় বলিল, "পাঁচু যে! চিনতে পারছ না? আমি তারক।"

তারকই তো বটে। হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে সে আমার সহপাঠী ছিল। সে একটু উত্তেজিত হইলে চারুপাঠের ছবির সিন্ধুঘোটকের চক্ষুর ন্যায় তাহার চক্ষু বিকট দেখাইত বলিয়া আমরা আড়ালে তাহাকে সিন্ধুঘোটক বলিতাম। স্কুলে তারক স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিল। ইদানীং মোহনবাগানের কীর্ত্তি যেমন ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি সে সময়ে 'জিতেন বাঁড়ুয্যে' বিলাতে সাহেব-বালকদিগকে কিরূপ উত্তম-মধ্যম দিয়াছিলেন, সেই কাহিনী এক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা ও অনুকরণের বিষয় ছিল। হুগলী কলেজিয়েটে সেই শ্রেণীর ছাত্রদের নেতা ছিল তারক। তারক ও তাহাদের দলের অনেকের বাড়ী ছিল হুগলীর পরপারে হালিসহর বলদেঘাটায়। হালিসহরে এণ্ট্রান্স স্কুল থাকিলেও, যে সকল ছাত্র দুই-চারিবার ফেল হইত, অথবা প্রোমোশন না পাইত, তাহাদের অভিভাবকেরা তাহাদের গ্রামস্থ স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া গঙ্গার অপরপারে হুগলী

কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতেন। তাহারা দুইবেলা নৌকা করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিত, তারকের দল যখন নিজেরা নৌকা বাহিয়া, গাঢ় তামাকের ধূম উড়াইয়া, হর্‌রা করিতে করিতে স্কুলে যাইত, তখন, ছাত্রের দল স্কুলে যাইতেছে কি ইয়ার বাবুদের দল স্ফূর্ত্তি করিতে দ্বাদশগোপালে যাইতেছে বুঝা যাইত না। তাহাদের আচরণ ও বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া, স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের "বলদেঘাটার বলদ" নামে অভিহিত করিতেন। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমি বলদেঘাটানিবাসী না হইলেও সেই বলদ সম্প্রদায়ের একজন ছিলাম।

সে সময়ে আমরা নিতান্ত বালক ছিলাম না। আমি বুঝিতে পারিতাম যে, দলের অন্য সকলের দুষ্টামিটা খেলার সামিল; কিন্তু তারকের প্রকৃতিই যেন হিংস্র ও দুষ্ট ছিল। দেখিতাম, সে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বা দুর্ব্বল বালকদিগের নির্য্যাতন করিয়া আনন্দ বোধ করিত; এবং কেহ তাহার প্রতি সামান্য অপরাধ করিলেও সে তাহা অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়া, প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজিত। নিজের গুণের তো সীমা ছিল না, অথচ মুরুব্বিয়ানা করিয়া নীচের ক্লাশের ছাত্রদের দোষ-সংশোধনের ছুতায় শাসন করা, তারকের প্রিয় কর্ম্ম ছিল। স্কুলের ছুটির পরে সে গেটের কিছু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং গৃহাভিমুখী কোন কোন ছাত্রকে ডাকিয়া "তুই আজ ক্লাসে last ছিলি কেন?" "বাঁদর, ছুটে চলেছিস্

কিসের জন্য” “রাস্কেল, কাল ডাকালে যে বড় পালিয়ে গেছলি ?” ইত্যাদি ভণিতাযোগে কাণমলা, চপেটাঘাত, গাঁট্টা ইত্যাদি দণ্ডবিধান করিত। যদি কোন বালক পরে মাষ্টারদের নিকট নালিশ করিত, অথবা যদি কোন বয়স্ক বালক কোন নির্য্যাতিত বালককে প্রহার হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিত তাহা হইলেই অনর্থ বাধিত ; সময়-সময় এই সূত্রে রীতিমত দাঙ্গার সৃষ্টি হইত।

তারক যে কেবল নিজে দুষ্ট ছিল, তাহা নহে ; যাহারা শিষ্টশান্ত, স্কুলে যাহারা “ভাল ছেলে” বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাদের প্রতি জাতক্রোধ ছিল,—সুবিধা পাইলেই তাহাদের অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিত। সঙ্গদোষে আমার যথেষ্ট অধঃপতন হইলেও, তারকের এই প্রবৃত্তিটি এবং দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, আমার আদৌ ভাল লাগিত না ; অথচ তাহার প্রতিবাদ করিতেও সাহস হইত না, কারণ কেহ বাধা দিলে তাহার গোঁ আরও বাড়িয়া যাইত। তাহার রকম-সকম দেখিয়া আমি এক একবার ভাবিতাম যে, তাহার পাগলামির ছিট আছে ; কিন্তু অন্যদিকে তাহার টনটনে বুদ্ধি দেখিয়া, আবার মনে হইত, হয়ত গাঁজা খাইয়া তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। সে যে গাঁজা খাইত, সে কথা কাহারও কাহারও মুখে শুনিতাম।

পাঠ্যাবস্থাতেই আমার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, আমি স্কুল ছাড়িয়া চাকরির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সে অবধি আর তারকের

সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু শুনিয়াছিলাম যে তাহার পরে আরও তিন চারি বৎসর সে স্কুলে ছিল। তাহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। সুতরাং তারকের অভিভাবকেরা তাহাকে যতদিন সম্ভব স্কুলে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তবে সে যে পাস্ টাস্ কিছু করে নাই, করিতে চেষ্টাও করে নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদিন পরে দেখা হওয়ায়, আমি এক নিঃশ্বাসে তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম। সে কাশীতে কোথায় থাকে, কি কাজকর্ম্ম করে, সন্তানাদি কি, পরিবারবর্গ কোথায়, ইত্যাদি। তারক সে সকল কথার উত্তর না দিয়া বলিল, 'আমাকে দুটি খেতে দেবে, পাঁচু?"

সে যদি বলিত, "ওহে, আজ তোমাদের বাসায় খাব"— তাহা হইলে বোধ হয় আমার কিছু মনে হইত না। কিন্তু তাহার কথার ধরণে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে তাহার কদর্য্য বেশভূষার প্রতি আকৃষ্ট হইল; বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহার অত্যন্ত দৈন্যদশা। এ অবস্থায় নানা অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়া হয় ত তাহার মনে ব্যথা দিয়াছি ভবিয়া স্ফূর্ত্তির ভাণ করিয়া বলিলাম, "তুমি খাবে, সে তো আমার সৌভাগ্য; আজ বহুৎ দানাদার মিলা মুসাফের"।

তারক বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সহিত চলিল। ইহাদের

অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কি করিয়া ইহার এরূপ দুরবস্থা হইল, এ কথা বারবার আমার মনে হইলেও, সে সম্বন্ধে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে তারকও আমার সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না ; এমন কি, বাসায় পৌঁছিয়া আমার পুত্রকন্যা দুইটিকে একবার কাছে ডাকিলও না। আরও দেখিলাম, সে যেন সর্ব্বদাই অত্যন্ত অন্যমনস্ক।

খাইতে বসিয়া, তারকের আহারে রুচি দেখিয়া বুঝিলাম, বেচারি বিলক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত ছিল। আহারের শেষাশেষি আমার স্ত্রী অবগুণ্ঠিতা হইয়া দরজার বাহির হইতে হাত বাড়াইয়া ঘরের মধ্যে দুধ ও মিষ্টান্ন রাখিয়া গেলেন। তারক এক মনে খাইতেছিল,—বাটি রাখার শব্দে দরজার দিকে দেখিয়াই হঠাৎ খাড়া হইয়া বসিল। তাহার হাত মুখে উঠিতে অর্দ্ধ-পথে থামিয়া গেল ; বিবর্ণমুখে আমার দিকে ফিরিয়া চাপা-গলায় কহিল "কে ও ? রাঙ্গাপাড় সাড়ী পরে ও কে ?"

আমি আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "কে আবার ? আমার স্ত্রী, আর কে ?"

"ওঃ ঠিক তো" বলিয়া যেন পরম আশ্বস্ত হইয়া তারক আবার আহারে মনঃসংযোগ করিল। আমি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে

উদ্যত হইয়া আবার নিবৃত্ত হইলাম ; ভাবিলাম, পরে সুবিধামত জিজ্ঞাসা করিব।

কিছুক্ষণ হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল ; আমরা ভোজনান্তে অন্য ঘরটিতে যাইয়া বসিতেই সবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তারক, "আঃ! শরীর স্নিগ্ধ হল, একটু ঘুমান যাক" বলিয়া একখানা মাদুরের উপর শুইয়া পড়িলে, আমি তামাক সাজিয়া আনিতে গেলাম। কাশীতে কেনা জারমান সিলভারের গড়াগড়াটি মাজিয়া জল ফিরাইয়া তামাক তৈয়ারি করিয়া আনিয়া দেখি, তারক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন একখানা আসন পাতিয়া বসিয়া, তামাক খাইতে-খাইতে আমি হিসাব লিখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার শিশু পুত্র ও কন্যাটি সেই ঘরসংলগ্ন বারান্দায় আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি এবং নীচের রাস্তায় পথিকদের দুর্দ্দশা দেখিতে দেখিতে তারস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"আইকম্ বাইকম্ তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুরবাড়ী
রেল্ কম্ ঝমাঝম্
পা পিছলে আলুর দম্।"

হঠাৎ "অ্যাঁ, অ্যাঁ, থাম্, থাম্, ওরে থাম্" বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া তারক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং চক্ষু পাকাইয়া বিকট দৃষ্টিতে ভোঁদা ও নেড়ির দিকে তাকাইয়া রহিল।

তাহার হঠাৎ হুঙ্কারে আমার হাত হইতে গড়গড়ার নলটা পড়িয়া গেল, ভোঁদা হতবুদ্ধি হইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল এবং নেড়ি ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমি অবাক হইয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি ? অমন করে উঠ্‌লে যে ?" কিন্তু তাহার হুঁস ছিল না ; সে একদৃষ্টে বারান্দার দিকে তাকাইয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল। এদিকে শিশু দুইটি তারকের দিকে সভয়ে তাকাইতে তাকাইতে যতদূর সম্ভব তাহাকে দূরে রাখিয়া, এক-পা এক-পা করিয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া, সেখান হইতে উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি তারকের গা ঠেলিয়া আবার দুই-একবার ডাকিতে, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিলাম, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও দৃষ্টি উদাস। তখন তাড়াতাড়ি একঘটি জল আনিয়া তাহার মাথায় ও মুখে সেচন করিলাম ; এবং পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম, "ভাল এক আপদ জুটেছে দেখ্‌ছি।" কপাটের অন্তরাল হইতে চাবির শব্দে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া স্ত্রী উদ্বিগ্নমুখে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে ?" এবং আমি মাথা নাড়িয়া 'কিছু জানি না, বলায় তিনি হস্ত সঞ্চালন করিয়া তারককে বিদায় দিতে বলিলেন। আমি মনে মনে হাসিলাম—তাঁহার নীড়টিতে ক্ষণেকের জন্য শান্তিভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তিনি এই অসুস্থ অবস্থাতেই তারককে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে

প্রস্তুত। করুণা ও স্নেহমমতার বশে নারী সর্ব্বদাই আত্মবিসর্জ্জন করে বটে, কিন্তু যাহার দ্বারা প্রিয়জনের তিলমাত্র অনিষ্ট বা অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, সে হাজার অনুকম্পার পাত্র হইলেও তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। তাহার কারণ এই যে, স্নেহের পাত্রকে নারী হৃদয় উজাড় করিয়া এত দিয়া ফেলে যে, অপরের জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

কিছুক্ষণ বাতাস করার পর, তারক আস্তে আস্তে বলিল, "থাক, আর হাওয়া করতে হবে না।" তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে বুঝিয়া, তাহার অদ্ভুত আচরণের কারণ জানিতে চাহিলাম। কিন্তু সে সংক্ষেপে "থাক" বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে, সে দুই চারিবার মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, অবশেষে কাতরভাবে বলিল, "আমার বুকের ভিতর কেমন করছে, এক ছিলিম খাওয়াতে পার?" আমি গড়গড়ায় নল লাগাইয়া দিতে, সে তাহা না লইয়া এক হাতের মুঠার মধ্যে অন্য হাতের আঙ্গুলগুলা ধরিয়া গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গী দেখাইল। তাহার ইঙ্গিত বুঝিয়া আমি প্রথমে বড়ই রাগিয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু তারক বড়ই কাকুতি মিনতি করিতে নরম হইয়া ভাবিলাম যে, আমি বারণ করিলেই সে কিছু আর পুরাতন নেশা ছাড়িয়া দিবে না; তাহা-ছাড়া, গাঁজা খাইলে হয় তো তাহার মন খুলিয়া যাইবে,—তখন সকল কথা শুনিতে

পাইব। ইহা ভাবিয়া, আমাদের গলির মোড়ে গণপতি মিশ্রের কুস্তির আড্ডা হইতে, সাধুসেবার নাম করিয়া তুই টিপ গাঁজা ও ও একটি কলিকা আনিয়া তারককে দিয়া বলিলাম, "বারান্দায় গিয়ে খেয়ে এস, নইলে দুর্গন্ধে বাড়ীতে টিক্‌তে পারব না।"

আপনার মনে অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে যখন সে বারান্দা হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, শূন্য কলিকাটী সন্তর্পণে একধারে রাখিয়া বসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, তাহার সেই ভয়াকুল অস্থির ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। কর্কশ নিরানন্দ হাসি হাসিয়া সে আপনা হইতে বলিল, "ওঃ, হঠাৎ ভারি অসামাল হয়ে গিয়েছিলাম।" আমি সুবিধা বুঝিয়া ব্যাপারটা কি বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে সে আর ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "আরে ভাই, সে অনেক কথা ; তা তোমার যখন শোনবার ইচ্ছা হয়েছে তখন বলছি শোন।"

এই বলিয়া জাঁকাইয়া বসিয়া তারক যাহা অম্লানবদনে বলিয়া গেল, তাহা তাহারই অকর্ম্মের কাহিনী ; কিন্তু সে সকল দুষ্কৃতির জন্য তাহার লজ্জা বা অনুতাপ দেখা গেল না ; বরং তাহার বর্ণনার ভঙ্গীতে বেশ বাহাদুরির ভাব প্রকাশ পাইল। আবার, স্থানে স্থানে হঠাৎ থামিয়া, সে আপনার মনে অল্প-অল্প হাসিতে লাগিল—যেন সেই কথাটার স্মৃতিতে সে আমোদ উপভোগ করিতেছে। সকল কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না ; এবং যাহা বলিল

তাহা কয়েকটি অসংলগ্ন ঘটনা মাত্র। সে সকল ঘটনাব উৎপত্তি কোথায় না জানিলে ব্যাপারটা ভাল বুঝা যাইতেছে না দেখিয়া আমি তারককে নানা প্রশ্ন করিয়া গোড়ার কথাটা বাহির করিয়া লইলাম, এবং তখন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিলাম। এই গোড়াব কথাটা আমি আমার নিজের ভাষায় বলিব ; পরে তারকের বর্ণিত ঘটনাগুলি সে যেমনভাবে বলিয়াছিল, ঠিক সেই-ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। অনেক দিন হইয়া গেলেও সেই বাদলা দিনের অপরাহ্ণে তারক ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ চক্ষে কর্কশ কণ্ঠে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহা আজও আমার কাণে বাজিতেছে।

* * * *

তারকদের পাড়ার বনিয়াদি মুখোপাধ্যায় বংশের শেষ বংশধব ধার্ম্মিক মাধবচরণ পারের কড়ি সংগ্রহের চেষ্টায় ঐহিক কড়ি নিঃশেষে ব্যয় করিয়া স্বর্গারোহণ করার পর, তাঁহার একমাত্র কন্যা সৌদামিনী স্বামীর সহিত কলিকাতায় যাইয়া বাস করিতে-ছিল ; এবং মুখোপাধ্যায়দেব পুরাতন ভদ্রাসন অনেক দিন জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। সৌদামিনীর স্বামী সিটী কলেজে মাষ্টারি করিত, এবং কুলীন সন্তান হইলেও, পয়সার অভাবে দায়ে পড়িয়া, সিটী কলেজের একজন ব্রাহ্ম মাষ্টারের বাসার এক অংশ ভাড়া

করিয়া, সপরিবারে থাকিত। তাহার পিতৃকুলে কেহ ছিল না, সুতরাং হঠাৎ অসময়ে তাহার মৃত্যু হইলে, সৌদামিনী গত্যন্তর না দেখিয়া, চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক পুত্র যদুর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আটদশ বৎসর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত পিতৃভিটায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং স্বামীর জীবনবীমার টাকার উপস্বত্বে কোন রকমে সংসার চালাইতে লাগিল।

সৌদামিনী দেখিল, আটদশ বৎসরে গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহার সমবয়স্কাদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বামিগৃহে চলিয়া গিয়াছে; যাহারা আছে, তাহারা ঘোর সংসারী হইয়া কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন-প্রাচীনারা অন্তর্ধান করিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে সৌদামিনীর অপরিচিতা বধূরা কত সংসারে গৃহিণী হইয়াছে। এই সকল কারণে সে প্রতিবেশীদের নিকট প্রথম প্রথম বিশেষ সহানুভূতি পাইল না, বরং দুইএকটা নির্দ্দোষ অভ্যাসের জন্য তাহাদের বিরাগভাজন হইল। কলিকাতায় ব্রাহ্মপরিবারের সহিত অনেকদিনের ঘনিষ্ঠতায় তাহাদের কোন কোন বাহ্য চালচলন সৌদামিনীর অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাহাতেই বিপত্তি ঘটিল। দুইদিন না যাইতে যাইতে, পাড়ার নারীবৈঠকে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকারের সমালোচনা হইতে লাগিল:—"মরণ আর কি, কপাল পুড়েছে, এখনও সেমিজ পরে বাহার দেওয়া হয়!" "হ্যাঁ লো, 'ব্যাটা-

ছেলেদের মত দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করা কি ঢং লো ?” “দেখলি ভাই কামিনী ছুঁড়ির ঢলাঢলির কথাটা বল’তে ‘পরের কথায় দরকার কি দিদি’ বলে মুখখানা কি রকম করলে? দেমাকে উলটে আছেন।” “আর মজার কথা শোন্; কাল ঘাটে গিয়ে দেখি ও পাঁচজন মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে চান করছে। আমি দু’বার ‘যদুর মা’ ‘যদুর মা’ বলে ডাকলুম, যেন শুনতেই পেলে না; যখন কঁ্যাটকঁ্যাট করে শুনিয়ে দিলুম, তখন বল্লে কি,—‘রাগ কর না পদ্মপিসি, সেখানে আমায় যদুর মা বলে তো কেউ ডাকতো না—সাণ্ডেল বাবুর বৌ আমার নাম ধরেই ডাকতেন—তাই বুঝতে পারি নি যে তুমি আমায় ডাকছ’; শোন কথা, ওকে সোহাগ করে সৌদামিনী বলে ডাকতে হবে—তবে সাড়া দেবেন।”

ব্যাপারটা সৌদামিনীর কর্ণগোচর হইতেই সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিশেষ সতর্ক হইল—যাহাতে কলিকাতার কোন অভ্যাস তাহার চালচলনে প্রকাশ না পায়। সুতরাং তাহার অখ্যাতিটা আর অধিক দূর গড়াইল না; লোষ্ট্রপাতক্ষুব্ধ জলাশয়ের চঞ্চলতার ন্যায়, তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল। কিন্তু এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া পল্লীবালকদের হস্তে তাহার পুত্রের যে নিগ্রহ আরম্ভ হইল, তাহার নিবৃত্তি হইল না। রাজারাজড়াদের মধ্যে, বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, যেমন সামান্য

সৈনিকেরা হুকুম পাইলেই, ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া মহোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ পল্লীগ্রামে বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে দলাদলি হইলে, বালকেরা ভালমন্দ না বুঝিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়; তবে তাহারা কাহারও অনুমতি বা উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। সৌদামিনীর ঢং ও দেমাকের কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইলে, তাহা বালকদেরও জানিতে বাকি রহিল না। ফলে, সৌদামিনীর পুত্রকে তাহারা শত্রুভাবে গ্রহণ করিল।

বলদেঘাটায় পৌঁছিবার দুইএকদিন পরে যদু গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া দেখিল, তাহার সমান ও অধিক বয়স্ক কয়েকজন স্নানার্থী বালক ঘাটে বসিয়া জটলা করিতেছে। তাহাদের সকলেরই কোঁচার কাপড় দৃঢ়ভাবে কোমরে বাঁধা, গামছা এরূপভাবে কোমরে জড়ান যে তাহার একটা কোণ পশ্চাতে ঝুলিতেছে। স্নানের পূর্ব্বেও মাথায় উচ্চ এলবাটতোলা টেরি বর্ত্তমান, এবং কাহারও কাহারও গলায় জিউলি আঠার মাজা পৈতা অতি শুভ্র তারের মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই ছোকরাদের আকার-প্রকার দেখিয়া তাহাদের প্রকৃতি অনুমান করিবার ক্ষমতা যদুর ছিল না। মাষ্টারদের ছেলেরা সচরাচর যেরূপ লেখাপড়ায় মনোযোগী ও সুবোধ হয়, যদুও সেইরূপ ছিল। অধিকন্তু, তাহার স্বভাব বড় সরল ছিল। মন্দসংসর্গে খারাপ হইয়া যাইবার ভয়ে, যদুর পিতা তাহাকে বড় একটা সমবয়স্কদের সহিত মিশিতে দিতেন না; এবং

জিনিসটা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই, বোধ হয় তাহার প্রতি যদুর লোভ ছিল। ঘাটে ছোকরাদের দেখিয়া, তাহাদের সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে সে স্মিতমুখে তাহাদের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইল।

যদু নিকটে আসিতেই ছোকরারা হঠাৎ নীরব হইয়া পরস্পরের মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। পরে একজন বলিয়া উঠিল "এক্ আভি ?" (১) ; তুই একজন উত্তর দিল "নাজি এন্" (২), এবং একজন বলিল "সোর সোর, লাক্ এয্ গামির থকা ছহিল, ধোব ছহে রাত এল্ছে, আন্ রাতক ?" (৩) ; ইহাতে সম্বোধিত তারক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "কিঠ্ এসি টবে, কসালে উখ্উম্‌-যেরদ ড়াবির রোদের ছাকে ড়াঁদিয়ে লিছ।" (৪) ; ছোকরার দল এই কথা শুনিয়া রীতিমত আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

উক্ত ভাষা কলিকাতার সন্নিহিত গ্রামসমূহের বালকশ্রেণীতে প্রচলিত উল্টা কথা—সাত-আট বৎসরের বালকেরাও এত দ্রুত

---

(১) কে ভাই ?

(২) জানি নে।

(৩) রোস রোস কাল যে মাগীর কথা হচ্ছিল, বোধ হচ্ছে তার ছেলে, না তারক ?

(৪) ঠিক বলেছিস, সেই বটে ; সকালে মুখুয্যেদের বাড়ীর দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিল।

কথা বলিতে পারে যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মন দিয়া শুনিলেও তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারে না। এই অদ্ভুত ভাষা শুনিয়া এবং ছোকরাদের রকম-সকম দেখিয়া যদু বড় দমিয়া গেল। গতিক ভাল নহে বুঝিয়া, সে সেখানে হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তারক "জমা থ্যাদ্, কোএ খিশ্‌শা ইদে ইদ্" (৫), বলিয়া আস্তে ব্যস্তে তাহার নিকট যাইয়া নিজের বাম হস্ত যদুর মুখে বুলাইয়া দিল এবং ইহাতে ছোক্‌রার দল মহা উল্লাসে অট্টহাস্য সহকারে হাত-তালি দিতে লাগিল। সাহেব-গ্যালাণ্ট সমাজে প্রতিদ্বন্দীর মুখে দস্তানা দ্বারা আঘাত করার মত, বখাট-বালক-সমাজে কাহারও মুখে বাঁ হাত বুলাইয়া দেওয়াটা ঘোর অবজ্ঞা ও অপমানের পরিচায়ক। যদু এই তথ্য না জানিলে অপরিচিত বালকদের এই প্রকার অপ্রত্যাশিত কুব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

"তার্‌কা, ও কি হচ্ছে" হাঁকিয়া একজন ভদ্রলোক খড়ম পায়ে খটখট করিয়া ঘাটের উপরের সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিলেন। তিনি তারকের পিতা উপরে দাঁড়াইয়া তাহাদের সকল কীর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। সোজা তারকের নিকটে আসিয়া তাহার কাণটি ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার! লেখাপড়া চুলোর দোরে গেছে, এখন পথে ঘাটে গুণ্ডামী করে বেড়াতে আরম্ভ করেছ? ফের যদি এরকম দেখতে পাই কি শুনি, তা'হলে বাড়ী থেকে

দূর করে দেব।” তাহার পর যত্নুর দিকে ফিরিয়া তাহার পরিচয় লইয়া বলিলেন “ওঃ, আমাদের সত্নুর ছেলে তুমি? আরে, তুমি এর মধ্যে এত বড় হয়ে উঠলে কি করে? তোমার ভাতের সময় মাধবদাদা ভারি যগ্গি করেছিল, সে তো সেদিনকার কথা মনে হচ্ছে। তোমার বাবা আমায় হালদার খুড়ো বলত; আহা! বড় ভাল ছোকরা ছিল সে। তার নাম রাখা চাই ভায়া। তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়? সেকেন্ ক্লাসে উঠেছ? এণ্ট্রান্স ইস্কুলের সেকেন্ ক্লাসে? বেশ বেশ, এই তো চাই।” তাহার পর তারকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “দ্যাখ হতভাগা, এ তোর প্রায় সমান বয়সী; কিন্তু তোর চেয়ে উঁচুতে পড়ে।” অবশেষে যত্নুকে সম্বোধন করিয়া তিনি সাবধান করিয়া দিলেন, যেন এই সকল ছোকরাদের সঙ্গে সে কখনও না মেশে; তাহা হইলে খারাপ হইয়া যাইবে।

যত্নুকে অপমান করিতে যাইয়া যত্নুরই চক্ষের উপর এবং বন্ধুবর্গের সমক্ষে পিতার দ্বারা শাসিত ও তিরস্কৃত হইয়া তারকের মাথা কাটা গেল। তাহার উপর আবার যে লেখাপড়ার জন্য সে চিরকাল তাড়না ও গালি খাইয়া আসিতেছে, সেই লেখাপড়ায় যত্নুকে তাহার অপেক্ষা ভাল বলাতে তারক মনে মনে আক্রোশে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, যত্নুকে নখে করিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলে। তারকের মনে

যদুর বিরুদ্ধে এই যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহা সহজে নিবিল না; মধ্যে মধ্যে নূতন ইন্ধন পাইয়া নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। পিতার ভয়ে সে প্রকাশ্যে যদুর প্রতি অত্যাচার করিতে বড় একটা সাহস পাইত না,—কলে কৌশলে তাহাকে নির্য্যাতন কবিতে চেষ্টা করিত।

তারক তখন হালিসহর স্কুলে পড়িত। তাহার পিতা তখনও গ্রামের স্কুলে তাহার বিদ্যালাভের সম্ভাবনায় হতাশ হইয়া তাহাকে হুগলী স্কুলে পাঠান নাই। যদুও হালিসহর স্কুলে ভর্ত্তি হইল। স্কুলে নবাগত বালকমাত্রেই অপরিচিত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়া বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করে; যদু সেই অবস্থা হইল। তাহা ছাড়া কলিকাতার স্কুলে পুরাতন ও ভাল ছাত্র এবং মাষ্টারের পুত্র বলিয়া যদুর যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহার অভাব সে এখানে সর্ব্বদাই অনুভব করিতে লাগিল। একটু সহানুভূতির জন্য যখন তাহার মন ক্ষুধিত, সেই সময়ে তারক তাহার নূতন নাম আবিষ্কার করিল "লাইন মশাই," অর্থাৎ length without breadth। যদু বড় রোগা ও লম্বা ছিল; এবং তাহার দেহের বৃদ্ধি বিবেচনা না করিয়া বয়সের হিসাবে কেনা ধুতি খাটো হইত বলিয়া, তাহাকে আরও লম্বা দেখাইত। সুতরাং তাহার "লাইন মশাই" নামটি বালকদের নিকট ভারি মানান সই বোধ হইল। নিজের চেহারা মনোমত না হইলে. অথবা কোন অঙ্গ কুশ্রী বা

বিকৃত হইলে, অনেক ভাবপ্রবণ বালক বড়ই ক্ষুন্ন হয়। যত্ন নিজের বেমানান শরীরের জন্য বরাবর কুণ্ঠা বোধ করিত। তাহার উপর যখন ছোট বড় বালকেরা যেখানে সেখানে তাহাকে "লাইন মশাই" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন সে মরমে মরিয়া গেল। ইহার পর আর একটি ঘটনায় সে আরও মর্ম্মপীড়া পাইল। সে একদিন স্কুলে আসিয়া দেখিল, কয়েকটি সহপাঠী মহা কৌতুকের সহিত ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত কি পড়িতেছে। যত্নকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। সে দেখিল বোর্ডে লেখা রহিয়াছে—

"মুখুয্যেদের সদু
বলে বাছা যদু
ঢ্যাঙ্গা হচ্ছ শুধু
খাও একটু দুধু
হবে নাদুস নুদু।"

যত্নর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল,—স্কুলের মধ্যে তাহার দুঃখিনী মাকে লইয়া ঠাট্টা! সজল চক্ষে কম্পিত কণ্ঠে সে হেডমাষ্টারের নিকট যাইয়া নালিশ করিতে তিনি আসিয়া তদন্ত করিলেন; কিন্তু কে উহা লিখিয়াছে, তাহার প্রমাণ না পাইয়া, সকলকে শাসাইয়া প্রস্থান করিলেন। যত্নর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ইহা তারকের কীর্ত্তি। তারক এবং যাহারা এই লেখা লইয়া

কৌতুক করিতেছিল, তাহাদের সকলের প্রতি ঘৃণায় তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

যদু পূর্ব্বে কখনও সমবয়স্কদেব সহিত মিশিতে পায় নাই। হালিসহরে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে সমবয়স্ক ও সহপাঠীদের দ্বারা বিনা কারণে বার বার লাঞ্ছিত হওয়ায়, মিশিবার ইচ্ছাও লোপ পাইল। সঞ্চরণশীল শামুক যেমন আঘাত পাইলে নিজের খোলার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তাহারও সেইরূপ অবস্থা হইল। সে আর বিনা প্রয়োজনে বাড়ীর বাহির হইত না; পথে সমবয়স্কদের সহিত দেখা হইলে, ত্রাস্তভাবে পাশ কাটাইয়া যাইত; এবং ক্রমে আর লোকেব সহিত সহজভাবে মিশিতে পারিত না। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, গ্রামের সকলের সহিত জানাশুনা হইয়া গেলেও, কাহারও সহিত তাহার বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা জন্মিল না;—অতি অল্প লোকেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইল। স্কুলের শিক্ষকেরা তাহার মেধার পরিচয় পাইলেন বটে, কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীদের তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না; তাহার বাহ্য আকার-প্রকারেও তাহার কোন লক্ষণ ছিল না; বরং তাহার বেমানান দেহ, ঈষৎ হাঁ-করা মুখ এবং নিরীহ ও মুখচোর প্রকৃতির জন্য তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই বোধ হইত।

সেই যদু প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস করিলে সকলে বিলক্ষণ বিস্মিত হইল; এবং পরে যখন খবর আসিল যে, সে জলপানি

পাইয়াছে,—তখন গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সৌদামিনী কাহারও অপ্রিয় না হইলেও সহায়সম্পত্তিহীনা বিধবা বলিয়া প্রতিবেশীদের মধ্যে বড় একটা খাতিরযত্ন পাইত না। কিন্তু সেদিন পাড়ার মুরুব্বিরা ও প্রবীণারা তাহার বাড়ীতে আসিয়া কতই আত্মীয়তা জানাইলেন—আনন্দের দিনে উদ্বেলিত স্বামিশোকে সৌদামিনীকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া, মিষ্ট তিরস্কারদ্বারা নিরস্ত করিলেন; যদুর প্রশংসায় ও তাহার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনায় গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

যদুর কৃতকার্য্যতায় তারক তুঁষের আগুনে পুড়িতে লাগিল; কিন্তু কি করিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না। স্কুলই যদুকে উৎপীড়ন করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল, সে তো সে গণ্ডি পার হইয়া গেল। তাহা ছাড়া তারকের সঙ্গীরা এখন যদুর সহিত 'লাইন মশাই' সম্বোধনের মত তুচ্ছ ফষ্টিনষ্টি করিতে লজ্জা বোধ করিবে। ইহা বুঝিয়া তারক নূতন প্রকারে শত্রুতা-সাধনের ফিকির খুঁজিতে লাগিল; এবং শীঘ্রই একটা সুযোগ পাইল।

তখন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু কলিকাতায় নূতন বাঙ্গালীর সার্কাস সৃষ্টি করায় স্কুলবয়মহলে জিম্‌নাষ্টিকের একটা হাওয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার অলিতে-গলিতে এবং সহরের বাহিরে গ্রামে-গ্রামে জিম্‌নাষ্টিক্‌-চর্চ্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। বলদেঘাটায়

এতদিন এ হাঙ্গাম ছিল না, কিন্তু চৌধুরীপাড়ার জিম্‌নাষ্টিক্‌ ক্লাব যখন বিশ্বনাথ বাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে 'পারফর্ম্মান্স' করিয়া 'ডেড্‌পয়েণ্ট্‌,' 'গ্রেট সার্কল্‌' প্রভৃতি 'বার প্লে' এবং থ্রি-ব্রাদার্সের' কাঁধের উপর নিশান হস্ত 'ফেয়ারি' ইত্যাদি অন্যান্য চটক্‌দার খেলা দেখাইয়া পাঁচখানা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষদের বাহবা লাভ করিল, তখন নিজেদের জিমনাষ্টিকের আখড়া খুলিবার জন্য তারকের দল আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেল। তাহারা স্কুল কামাই করিয়া একখণ্ড পতিত জমি হইতে সেওড়া ও ভেরেণ্ডার জঙ্গল সাফ করিল এবং গঙ্গার চড়া হইতে বালি আনিয়া সেখানে ছড়াইয়া একদিনেই 'গ্রাউণ্ড্‌' প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। পয়সা তো নাই, প্যারালেল্‌ ও হরাইজণ্টাল্‌ বারের জন্য কাঠ ও লোহার দণ্ড, বারের খুঁটি খাড়া রাখিবার জন্য তার ইত্যাদি আসে কোথা হইতে? যুক্তি করিয়া তাহারা রাত্রিকালে রেলওয়ে লাইনের বেড়া হইতে তার কাটিয়া আনিল; এবং তারকের প্ররোচনায় স্থির করিল যে, মুখুয্যেবাড়ীর অর্থাৎ যদুদের বাড়ীর এক অংশে যে কয়েকটা অব্যবহৃত ঘর পতনোন্মুখ হইয়াছে, অন্ধকার রাত্রে তাহার জানালা ভাঙ্গিয়া, সেই কাঠ ও গরাদে দিয়া 'বার' নির্ম্মাণ করিবে। এই প্রস্তাবে দলের কেহ কেহ প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু কাছাকাছি অন্য কোন ভাঙ্গা বাড়ীতে এত বড় বড় জানালা নাই, দূর হইতে ভারী কাঠ ইত্যাদি বহিয়া আনা

মুস্কিল এবং তাহাকে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অধিক,—এইরূপ নানা যুক্তি প্রয়োগে তারক তাহাদের সম্মত করাইল।

ভাঙ্গা দেওয়াল হইতে জানালাটা খসাইয়া লইবার চেষ্টায় সজোরে দুই তিন ঝাঁকানি দিতেই তাহা প্রাচীরের অর্দ্ধাংশ লইয়া হুড়মুড় করিয়া প্রচণ্ড শব্দে ভূমিসাৎ হইল; এবং চমকিত তারকের দল সামলাইয়া উঠিতে-না-উঠিতে "কি হ'ল" করিয়া যদু ও দুই একজন প্রতিবেশী বাহির হইয়া আসিল। বেগতিক দেখিয়া তারক প্রভৃতি ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল; কিন্তু তাহাদের একজন যদুদের উঠানের উচ্চ প্রাচীরের উপর উঠিয়া পাহারা দিতেছিল,—তাড়াতাড়ি পলাইতে সে উঠানের মধ্যে বেকায়দায় পড়িয়া গিয়া গোঁ-গোঁ করিতে লাগিল, এবং যদু ও প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল।

এই ছোকরার দ্বারা জানালা চুরির বৃত্তান্ত ফাঁস হইয়া গেলে জিম্‌নাষ্টিক্ যশোলিপ্সুদের লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না; এবং বুড়াবয়সে তারক বাপের দ্বারা খড়মপেটা হইল। এই ঘটনার ফলে যদুর বিরুদ্ধে তারকের শত্রুতা আর এক মাত্রা উপরে উঠিল।

যদু হুগলী কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত এল্-এ পাশ হইলে, চৌধুরীপাড়ার বিশ্বনাথ বাবু তাঁহার সহিত নিজের কনিষ্ঠা কন্যা রাসমণির বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বিশ্বনাথ বাবু কুলীন, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং দারুণ কৃপণ; তিনি বিবাহে বিশেষ কিছু

অবস্থায় সে ক্লাস শাসনে রাখিতে পারিবে না সন্দেহ করিয়া, তিনি তাহার কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিলেন। মক্ষিস্বভাব ছাত্রদের একথা জানিতে বাকী রহিল না।

ইহার বৎসর দুই পূর্ব্বে, গ্রামের স্কুলে তারকের বিদ্যার চূড়ান্ত হইয়াছে বুঝিয়া, তাহার পিতা তাহাকে হুগলী-কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সেই স্কুলেই যদু এখন মাষ্টার হইল —নীচের ক্লাসের শিক্ষক হইলেও মাষ্টার তো বটে। অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর কষাঘাতে অস্থির হইয়া তারক একবার স্কুলের বন্ধন হইতে চিরমুক্তির জন্য দড়ি-দড়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পিতার কঠিন শাসনে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে চুপচাপ করিয়া রহিল। তখন হইতে সে সাবধানে যদুকে দূরে পরিহার করিয়া চলিত; কিন্তু মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল, কিসে যদুর মাষ্টার হইবার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিবে। সে বুঝিল যে, ভালমানুষ যদুকে সে একদিন-না-একদিন হেড্‌মাষ্টারের নিকট জব্দ করিতে পারিবে।

যদু উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বনাথবাবু কন্যাকে স্বামিগৃহে রাখিতে ততটা রাজী নহেন বুঝিয়া, এবং সুখের ক্রোড়ে পালিত বালিকা দরিদ্রের সংসারে বড় কষ্ট পাইবে ভাবিয়া, সৌদামিনী এ পর্য্যন্ত বড় সাধের বধূকে একক্রমে বেশী দিন কাছে রাখে নাই; তাকে মধ্যে মধ্যে আনিয়া আবার দুইচারি দিন পরে

বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিত। বধূ রাসমণি ইদানীং সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছিল ; আজকাল স্বামিগৃহে দুইচারিদিন থাকার পরেই যখন তাহার যাইবার কথা উঠে, তখন তাহার ভারি অভিমান হয়—কেন হয়, কাহার উপর হয়, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সেদিন সারাদিন তাহার মনটা রাত্রে স্বামিসাক্ষাতের প্রতি পড়িয়া থাকে ; যেন কত কথা বলিবার আছে ; কত অনুযোগ করিবার আছে। কিন্তু কৈ, দেখা হইলে তো কোন কথাই মুখে আসে না,—কেবল চক্ষু ছাপাইয়া জল আসে, বুকের মধ্যে কি ঠেলিয়া উঠে—তখন আবার বড় লজ্জা হয়। 'উনি'' যদি জিজ্ঞাসা করেন চোখে জল কেন, গলা ভার কেন, তখন কি জবাব দিবে ? তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া শ্বাশুড়ি যখন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, "বাড়ীর জন্যে মন-কেমন করছে মা ? এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে ?" তখন সে রুদ্ধকণ্ঠে আস্তে আস্তে বলে "আমার তো মা নেই, এর মধ্যে সেখানকার জন্যে মন-কেমন করবে কেন ? এখানে আমার তো কোন কষ্ট হয় না মা''। কিন্তু তাহার মন বলে ''মাগো, আমার একানকার জন্যেই মন-কেমন করে, তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না।" পালকীতে তুলিয়া দিয়া যখন তাহার শ্বাশুড়ী চিবুক ধরিয়া বলেন "আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমায় পাঠিয়ে আমার ঘর অন্ধকার হয়ে থাকবে ; তোমায় আবার শীগ্‌গিরই আনব মা।" তখন সে আনতমুখে কোন রকমে অশ্রু লুকাইয়া রাখে। পালকী

চলিতে আরম্ভ করিলে, চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া লয়; আবার তখনই চাহিয়া দেখে, পালকী। দরজা ফাক আছে কি না—যদি কেহ তাহার কান্না দেখিতে পায়, তাহা হইলে ভাবিবে, "মেয়েটা কি বেহায়া, বাপের বাড়ী যেতে কাঁদছে"—ছি!

বয়স্থা বৌ লইয়া ঘর করিতে না পারায়, সৌদামিনীর বড় ক্ষোভ ছিল! তাহার উপর বধূ সসত্বা শুনিয়া অবধি তাহাকে আনিয়া কাছে রাখিবার জন্য সে বড় ব্যাকুল হইয়াছিল,—"আহা বৌটার মা নেই, কেই বা তাকে দেখে, কেই বা এটা-সেটা খাওয়ায়।" যদুর চাকরিটি হইতেই, সৌদামিনী কাল বিলম্ব না করিয়া বৌ আনাইল। বৈবাহিকের সহিত কথা রহিল, এখানেই পঞ্চামৃত সম্পন্ন করিয়া তাহার মাস দুই পরে বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইবে। এখন হইতে তিনটি প্রাণী বড় শান্তিতে কাটাইতে লাগিল। তবে বধূর বিরুদ্ধে সৌদামিনীর স্নেহের অভিযোগের অন্ত ছিল না;—বধূর সহিত আর পারিয়া উঠা যায় না; ভাত খাইবার জন্য ডাকাডাকি করিলে, সে শাশুড়ীর সহিত অধিক বেলায় খাইবার অভিপ্রায়ে পলাইয়া বেড়ায়; পই-পই করিয়া বারণ করিলেও শ্রমসাধ্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে বসিয়া যায়; সারাদিন পা মুড়িয়া বসে না, ও ভাল জিনিস খাইতে বলিলে বাঁকিয়া বসে; কাজেই তাহার কণ্ঠার হাড় বাহির হইতেছে এবং কাঁচা সোণার মত রং কালি হইয়া যাইতেছে। বৌমার যত

অনাসৃষ্টি কাণ্ড, বাপের বাড়ী হইতে যে পয়সা আনিয়াছিল, তাহা খরচ করিয়া বোকা মেয়ে শ্বাশুড়ীর জন্য সন্দেশ-রসগোল্লা আনায় —এইরূপ বধূর নানা দোষের জন্য সৌদামিনী যত বকাবকি করে, তত মুগ্ধ হয়।

দম্পতি হৃদয়ে পূর্ব্বের প্রেম এখন অবাধ ঘনিষ্ঠতায় গাঢ়তর হইল, এবং বন্ধুহীন যদুর গভীর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সুন্দরী স্নেহময়ী স্ত্রীর প্রতি ধাবিত হইল। সে চটুল কথায় বা আদরে সোহাগে ভালবাসা দেখাইতে জানিত না, কিন্তু রাসমণিকে দেখিলে তাহার চক্ষে হৃদয়ের নির্ব্বাক পূজা ফুটিয়া উঠিত। রাসমণির সহিত কথা কহিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বরে অসীম স্নেহ ঝরিত, তাহার সহিত ব্যবহারে গভীর কোমলতা প্রকাশ পাইত এবং রাসমণির সামান্য অসুখে যদুর সন্ত্রস্ত অবস্থা ব্যবস্থা ও ব্যাকুল প্রশ্ন অন্তরের ব্যথা ও করুণার পরিচয় দিত। রাসমণিও স্বামিপ্রেমে এরূপ তন্ময় হইয়া উঠিল যে, একদিন তাহার মত শান্ত লাজুক বধূও পাড়ার অনেকগুলি যুবতীর সাক্ষাতে প্রগল্‌ভভাবে স্বামীর প্রতি টান দেখাইয়া পরে বিষম লজ্জা পাইয়াছিল। সেদিন তাহাদের বাড়ী ঐ সকল যুবতীরা মিলিয়া কথায় কথায় পরস্পরের স্বামি-সৌভাগ্যের আলোচনা করিতে করিতে একজন বলিয়া উঠিল, "তোরা বিন্দির ডাক্তারের নিন্দে করছিস, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে আমাদের যদু দাদার চেয়ে দেখতেও ভাল, রোজগারও

করে বেশী। হাঁ, বৌদিদি রাগ কর না ভাই, কিন্তু তোমার বাপ কি দেখে বিয়ে দিয়েছিল, বুঝতে পারিনে।" রাসমণি এই কথায় আত্মহারা হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর মত দেবতুল্য স্বামী হালিসহর গ্রামে কাহারও নাই; এরূপ স্বামীর হস্তে পড়িয়া সে নিজেকে রাজ-বধূর অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনে করে এবং বিধাতার নিকট প্রার্থনা করে যেন জন্মজন্মান্তরে ইঁহাকেই স্বামীরূপে পায়। রাসমণির এই আচরণ লইয়া মেয়েমহলে দিনকয়েক নিন্দা ও টিটকারির ধূম পড়িয়া গেল।

ইতিমধ্যে বিধাতা এই ক্ষুদ্র সুখী পরিবারের অদৃষ্টসূত্র জটিল করিতেছিলেন। পল্লীগ্রামে অবরোধ প্রথার বাঁধাবাঁধি নাই। তারক ঘটনাক্রমে তুইচারিবার রাসমণিকে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ সম্পন্ন হইয়া পড়িল! তারক অভিসন্ধি করিয়া এই কাণ্ডটি বাধাইয়া বসে নাই! তাহার অন্য নানা দোষ থাকিলেও চরিত্রদোষ ছিল না। পাড়ার বৌঝিদের কাহারও প্রতি সে প্রলুব্ধ হয় নাই। কিন্তু রাসমণির সৌন্দর্য্য কেমন তার চোখে লাগিয়া গেল, তাহাকে তুই চারিদিন দেখিয়াই সে একেবারে মোহিত হইয়া পড়িল। প্রথমটা সে নিজের মনোভাবে বিস্মিত হইয়া তাহা সামলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল: কিন্তু এই প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় তাহার উদ্দাম স্বভাব ক্ষীণ ইচ্ছা-শক্তির শাসন মানিল না। ক্ষণে ক্ষণে রাসমণির করুণ চক্ষুদুটি ও মধুর মুখখানি তাহার মনে

উদয় হইয়া চোখেদেখার স্পৃহা জাগাইয়া তোলে। তাই সে সর্ব্বদা রাসমণিকে দেখিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রেমিকসুলভ অনুসন্ধিৎসায় সে অচিরে যদুর পরিবারস্থ সকলের গতিবিধি আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। সকাল ৬টা বাজিতেই সৌদামিনী বধূর সহিত গঙ্গাস্নানে যায়, সাড়ে নয়টার সময় যদু কার্য্যে বাহির হইলে রাসমণি জানালায় দাঁড়াইয়া স্বামীকে দেখে এবং সে স্ব বহির্ভূত হইলে জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। বেলা তিনটার জানালা খুলিয়া দিয়া যখন সে ঘর ঝাঁট দিয়া বিছানা করে, তখন তাহাকে রাস্তা হইতে দেখা যায়। ছুটির দিনে সারাদিন জানালা খোলা থাকায় রাসমণিকে যখন তখন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার কাছে প্রায়ই যদু থাকে—ইত্যাদি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে বুঝিয়া লইল, কখন ও কি প্রকারে রাসমণিকে লুকাইয়া দেখিতে পারিবে।

গোড়ায় চোখের দেখার অধিক কোন আকাজ্ক্ষা তাহার ছিল না; কিন্তু ক্রমে তাহার পিপাসা অন্যরূপ দাঁড়াইল। সে যে ভালবাসে তাহা একবার জানাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু ততদূর সাহস তারকের নাই। প্রেমের গতিই অন্তঃসলিলা, তাহার উপর সে চিরকুটিল প্রকৃতি এবং এখনও তরলবুদ্ধি। বয়স হইলেও সে স্কুলের ছাত্র মাত্র। সুতরাং সে অগ্রসর হইতে না পারিয়া মনে মনে গুমরাইতে লাগিল। সে যদি এটুকুও বুঝিতে

পারে যে, রাসমণি বিরক্ত হইলেও তাহাকে ঘৃণা করিবে না, অথবা তাহার কথা প্রকাশ করিবে না—তাহা হইলে সাহস হয়, কিন্তু কৈ সেরূপ কোন লক্ষণই তো সে দেখিতে পায় না। বরং প্রেমিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে পদে পদে রাসমণির পতিপরায়ণতার পরিচয় পায় এবং তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া যায়। যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রাসমণি স্কুলযাত্রী স্বামীর প্রতি চাহিয়া থাকে, তাহা তারককে তপ্তশলাকার মত বিদ্ধ করে। রাসমণির সিঁথিতে সিন্দূরের আড়ম্বর তাহার চক্ষে সূচ ফুটায়। কাহার গৌরবে রাসমণি প্রায়ই চওড়া লালপাড় সাড়ী পরে, তাহা ভাবিলে রাসমণির প্রতি তাহার মন বিমুখ হইয়া যায়। ক্বচিৎ কখনও তারকের ক্ষুধিত চক্ষুর উপর চক্ষু পড়িলে রাসমণি যেরূপ শিহরিয়া, সঙ্কুচিত হইয়া, নিমেষে সরিয়া যায়—তাহাতে হঠাৎ তারকের মাথায় খুন চড়িয়া যায়; তাহার একটা উন্মত্ত ইচ্ছা হয়—লম্ফ দিয়া ঐ জানালাটা ভাঙ্গিয়া চুলের ঝুঁটি ধরিয়া রাসমণিকে টানিয়া আনিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া মুখ ফিরাইলে কি হয়! আর যে যত্নর জন্য সে তারককে উপেক্ষা করে, তেমন দশটা যত্নর সাধ্য নাই তারকের বিক্রম হইতে তাহাকে রক্ষা করে;—ভাবিতে ভাবিতে তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয় ও বাহুর মাংসপেশী এবং চোয়াল শক্ত হইয়া উঠে। পরক্ষণেই আবার করুণায় তাহার মন গলিয়া যায়; আহা, কোন্ প্রাণে রাসমণিকে ব্যথা দিবে? নিজের

নিষ্ঠুর চিন্তার জন্য অনুতাপ সারাদিন তাহাকে চাবুক মারিতে থাকে।

মনের আগুন হইতে পরিত্রাণের জন্য তারক গাঁজার আগুনের রীতিমত উপাসনা আরম্ভ করিল। গাঁজার প্রসাদে তাহার সকল প্রকার দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যায়, অবসন্ন আসন্ন মন সতেজ হইয়া উঠে, অভিযোগ উষ্মায় পরিণত হয় ও জ্বালা জিঘাংসার আকার ধারণ করে। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সে রাসমণিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; তখন কল্পনায় তাহাকে নির্ম্মমভাবে ভজনা করে; ও যদুকে রাসমণির চক্ষের উপর বিধিমতে বিপর্য্যস্ত করিয়া—সে যে একটা অপদার্থ. হেয় জীব—তাহা প্রতিপন্ন করিয়া পরম আরাম অনুভব করে। মানসিক অশান্তির উপর ঘন ঘন গাঁজা সেবন করিয়া তারকের স্বভাব কতকটা বিকৃত হইয়া গেল; কথা বলিলে মারিতে আসে, এইরূপ রুক্ষ মেজাজ হইল।

রাসমণির প্রতি আর তাহার চক্ষুলজ্জা রহিল না—রাসমণি জানালার বাহিরে তাকাইলে প্রায়ই দেখিতে পায়, কে একজন জ্বলন্ত চক্ষে কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে ভয়ে আর জানালা খুলে না। চোখের দেখায় বঞ্চিত হইয়া, তারক দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার উদ্দেশ্যে, বাড়ীর মেয়েদেব নিকট কৌশলে যদুদের কথা উত্থাপন করিয়া রাসমণির খবর লইতে লাগিল, কিন্তু তাহার দুরদৃষ্টক্রমে ইহাতে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল

লাভ হইল। সে দুই একদিনের মধ্যেই শুনিল, রাসমণি কিরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া স্বামীর গর্ব্ব করিয়াছিল; এবং এই খবরের জ্বালা কমিতে না কমিতে, একদিন তাহার ভগিনী বলিল, "আর শুনেছ দাদা, যদুদা'র বৌ চুপি চুপি আমাদের বলছিল যে, যমদূতের মত কে একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঘের মত চোখে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে দু'তিন দিন দুপুরবেলা দেখেছে। যদুদার গোঁ হয়েছে, সেই মিন্সেটাকে ধরবে। কিন্তু আমার তো বাপু মনে হয়, এ সব ভূতুড়ে কাণ্ড; পোয়াতি মানুষের ঠিক দুপুরবেলা ও-রকম বিকট চেহারা দেখা বড় অলক্ষণ—বড় অলক্ষণ; বৌটার ভালমন্দ কিছু না হয়।"

রাগে, অপমানে, অভিমানে ও নৈরাশ্যে তারক জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু বাঘের মত, তাহার চেহারা যমদূতের মত! এই কথা যত মনে হয়, ততই সে অধীর হইয়া উঠে। আবার রাসমণি, স্বামী ও সাথীদের, কাছে তাহার কথা বলিয়া দিয়াছে—বাস্, সব শেষ। বলিয়া দিবার মত তারক কি করিয়াছে? সে তো কেবল কাঙ্গালের মত চাহিয়া থাকে—এটুকুও রাসমণির অসহ্য হইল! এইরূপ এক একটা চিন্তা শত বৃশ্চিকের মত তারককে দংশন করিতে লাগিল। তাহার পর কি হইল, তাহা তারকের ভাষায় বলিতেছি।

## তারকের কথা।

আমার বোনের কথা শুনে, সারাদিনটা হন্যে কুকুরের মত কাটালুম। রাত্রে খেতে ডাকলে, খেতে বসলুম; কিন্তু খাব কি, উগ্‌রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সমস্ত রাত চোখের পাতা বুজতে পারলুম না। বর্ষাকাল, ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, সবাই আরামে ঘুমুচ্ছে, কেবল আমি ছটফট করছি—সে বড় কষ্ট। শেষ রাত্রে মনে হল, বাঃ আমার এমন ওষুধ রয়েছে এতক্ষণ ভাবিনি। উপরি-উপরি দু'তিন ছিলিম খেতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল, বাঁচলুম। তখন মনে হল, যা' হবার হয়ে গেছে, আর ভুলেও তার কথা ভাববো না। ইস্, যতুর জন্যে এত গুমোর! যতু আবার আমায় ধরবে বলেছে। যতুটা মরে না? যতুর মার খুব জ্বর শুনেছি, সে মাগী মরে, তা'হলে যতু খুব একটা ঘা খায়, বেড়ে মজা হয়। রোস, যতুর মা তো বিছানায় পড়ে,—তা'হলে যতুর বৌ নিশ্চয়ই একলা গঙ্গাস্নানে যায়; আজকাল সেই সময়টা তো তাকে দেখবার খুব সুবিধে। সুবিধের কথা মনে হইতে তাকে আর একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হল—ক'দিন যে তাকে দেখতে পাইনি। ঠিক করলুম, এই এক-বারটি তাকে দেখে নিয়ে, ব্যস্—আর এ জন্মে তার কথা ভাববো না। এই কথা মনে হতেই, আর থাকতে পারলুম না,—বেরিয়ে পড়লুম।

তখন ভোর হয়ে গেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে; কিন্তু আকাশ মেঘে অন্ধকার, পথে জনপ্রাণী নেই। যদুদের গলির মোড়ে একটা বড় তেঁতুল-গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম। একবার হুঁস হল, মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে—গাছপালা, পথ—যেন সব নেচে-নেচে উঠছে; কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না, পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না,—হঠাৎ চমক ভেঙ্গে দেখি, সে আসছে। আমার বুকের ভিতর ঢেঁকি পাড় দিতে লাগ্‌ল। সে তেঁতুল গাছটার সাম্‌নাসাম্‌নি আসতেই, আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়লুম—কেন বেরুলুম জানি না—মাইরি বলছি। আড়াল থেকে তাকে একবার দেখা ছাড়া, আমার অন্য মৎলব ছিল না। আমি হঠাৎ বেরুতেই, সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে, মুখ তুলে চাইলে;—ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাস-পানা হয়ে গেল। তার পর তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে, ফস্ করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার মাথার ভিতর কি একটা খট্ করে উঠল; চারিদিক যেন লালে-লাল হয়ে গেল—কেন জানি না, ভয়ানক চেঁচাতে চেঁচাতে তাকে তাড়া করলুম। সে একবার পিছন ফিরে আমাকে দেখেই দৌড়াতে আরম্ভ করলে; কিন্তু পথ বড় পিছল ছিল, কিছু দূর যেতেই পা পিছলে "মা গো" বলে চীৎকার করে আছাড় খেয়ে পড়ল। আমি কাছে পৌঁছে দেখি, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, আর গ্যাঙ্গাচ্ছে।

আমি ইচ্ছা করে তাকে তাড়া করিনি, কোথা দিয়ে চক্ষের নিমিষে কি হয়ে গেল।

তার পর সব কথা আমার ঠিক্ মনে নেই। সেখান থেকে কখন পালিয়েছিলুম, কি ভেবেছিলুম—কিছুরই হুঁস ছিল না। যখন হুঁস হল, দেখি—আমাদের আঁব বাগানে বসে আছি, আর বুকের ভিতর থেকে গুরগুর করে হাসি ঠেলে ঠেলে উঠছে। একবার চাপতে না পেরে, হা-হা করে খুব একচোট হেসে নিলুম; তারপর মুখে কাপড় গুঁজে দিলুম। আবার বোধ হল, বুক ফেটে যাচ্ছে, খুব খানিকটা চেঁচালে ভাল হয়ে যাবে। "ওরে, প্রাণ যায় রে" বলে প্রাণপণে চেঁচালুম! তারপর শুনলুম, কারা যেন সব কাঁদছে। বড় কান্না পেলে। কাঁদতে কাঁদতে ভাবলুম, আমি এমন করছি কেন? ভয় হল; ছুটে বাড়ী গেলুম। সেখানে মনে হল, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে! তার চেয়ে ইস্কুলে চলে যাই। তখনই বেরিয়ে পড়লুম। নৌকাতে মেঘা-মাঝি পাল মুড়ি দিয়ে খাচ্ছিল আমায় বল্লে, "একটু বস, দাদা-ঠাকুর, খেয়ে নি; আজ যে বড় সকাল সকাল?" দেখি সে আলুর দমের মত কি তরকারি দিয়ে ভাত খাচ্ছে। চাঁচিমাখা সেই আলু দেখে যদুর বৌ সেই যে কাদা মাখামাখি হয়ে পথে পড়েছিল—তাই মনে পড়ে গেল। আলুর দম দেখ্‌লেই এখনো

আমার যদুর বৌয়ের সেই কাদামাখা মূর্ত্তি মনে পড়ে। আমি আলুর দম খাই না, তা জান?

তুমি ভাবছ, আমি পাগল হয়ে গেছলুম না? আমি পাগল? কখনো না। পাগলের কখনও অত কথা মনে থাকে? দেখলে তো, আমি সব কথা ঠিকঠাক বলে গেলুম,-- মায় মেঘা মাঝির কথা পর্য্যন্ত। আচ্ছা, পাগল কখনও চালাকি করতে পারে? আমি পাগল হলে কখনও পালিয়ে বাগানে গিয়ে বসে থাকতুম কি? না হয় পালাবার সময়ে খেয়াল ছিল না তাতে কি? তারপর সেদিন ইস্কুলে কেমন এক প্ল্যান খাটিয়েছিলুম,—পাগল হলে পারতুম কি? আমাদের ক্লাসের পাশেই একটা ক্লাসে যদু পড়াত; সেদিন সাড়ে দশটা বেজে গেলেও, শুনতে পেলুম— সে ক্লাসে ভারি হট্টগোল হচ্চে। শুনলুম, যদু আসেনি। ঝাঁ করে প্ল্যান মাথায় এলো, ও ক্লাসে হট্টগোল শুনে তো, এখনই হেডমাষ্টার মশাই ছুটে দেখতে আসবেন, ব্যাপার কি। সেই সময় তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আজ বাদলার দিন পেয়ে, যদু ইস্কুল কামাই করে, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বসে আছে চুপি চুপি ও-ক্লাসে গিয়ে, ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে বোর্ডে বড় বড় করে লিখে রাখলুম—

I come, you come তাড়াতাড়ি,
যদু মাষ্টার শ্বশুর-বাড়ী।

Rain come ঝমাঝম—

পা পিছলে আলুর দম।

অর্থাৎ তুমি আমি জলকাদা ভেঙ্গে ইস্কুলে এসেছি, কিন্তু যত্ন মাষ্টার বাদলার দিনে শ্বশুরবাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করছে। শেষ দুটো লাইন যত্নর বৌয়ের সম্বন্ধে—তার সেই কাদামাখা মড়ার মত চেহারা কেবলই মনে পড়ছিল; তাই বোধ হয় ও দুটো লাইন লিখেছিলুম।

তারপর? হ্যাঁ, তার পর—কৈ, আমি তো অন্যমনস্ক হইনি সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরতে—নৌকা থেকে আমাদের ঘাটে নেবে দেখি, খানিক দূরে কার চিতা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আর সেইখানে কাদার উপর বসে চিতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে—যত্ন!

না না, আর বসতে পারছিনে, আমি চল্লুম। কি বলছ? রাসমণি কি করে মরল? লোকে বল্লে, গঙ্গাস্নান করতে যেতে পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে পেটে চোট লেগেছিল; সেই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তারপর আর তার জ্ঞান হয়নি—ও পার থেকে ডাক্তার আনতে আনতে, সব শেষ।

এক গ্লাস জল খেতে দেবে? চুপি চুপি একটা কথা বলি শোন। যখন জল আনতে গেলে, তখন একটা গ্যাঙ্গানি শুনতে পাচ্ছিলে কি? তা হবে, আমারই ভুল হয়েছিল। একলা থাকলেই

রাসমণির গাঙ্গানির মত আওয়াজ শুনতে পাই; অন্ধকারে থাকলে তার সেই লালপাড় সাড়ীপরা কাদায় লুটোপুটি মূর্ত্তি সামনে দেখিতে পাই; চোখ বুজ্‌লেই তার পালাবার সময় সেই ভয়-মাখান অসহায় চাহনি দেখিতে পাই। ভোলবার জন্যে কেবলই ঘুরে বেড়াই, কোথাও তিষ্ঠিতে পারি না, কিন্তু ভুলি না তো। আচ্ছা, এসব কি পাগলামির চিহ্ন বলে তোমার মনে হয়? পাগল হলে কি ভুলতুম না? আমি পাগল নই। ওরে এ-এ-এ— প্রাণ যায় রে এ-এ-এ—আচ্ছা, চেঁচালুম কেন?

সমাপ্ত।

## —তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ

সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

বাঙ্গলা সাহিত্যে নানা বিষয় সম্বলিত উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ পুস্তকের প্রচার বিরল না হইলেও আশানুরূপ নয়। এই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীকরণার্থ আমাদের পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক কতিপয় খ্যাতনামা প্রফেসর ও সাহিত্যিকগণের পরামর্শ ও নির্দ্দেশক্রমে আমরা সুলভে সৎসাহিত্য প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদের সঙ্কল্প,—নীতি ও রুচিসঙ্গত, প্রীতিপদ, মনোজ্ঞ উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষিগণের জীবনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ জনপ্রিয় পুস্তক সকলও (Books on Popular Science & Nature study) প্রকাশ করিব।

সঙ্কল্পের তুলনায় আমাদের শক্তি অতি সামান্য—ভরসা আপনার সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি। আশা করি আমাদের সিদ্ধির পথে আপনি আমাদিগকে উৎসাহ দানে বিমুখ হইবেন না। আমাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া যদি অভয় দেন আমরা আপনার নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিব ও ক্রমশঃ প্রকাশিত পুস্তকগুলিও পাঠাইয়া দিব।

আপনার ন্যায় সাহিত্যরসজ্ঞ সহৃদয় মাতৃভাষার সেবককে অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি

বিনীত—মুখার্জ্জী, বোস এণ্ড কোং।

শেষ পাচ্ছি

১৩১৯ ১৩২০ সালে আমাদের প্রকাশিত ও ক্রমশঃ

প্রকাশ্য পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উপন্যাস—

মনাকা — শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়

অদৃষ্টলিপি — অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার এম-এ

জীবন সংগ্রাম „ „ „ „

জীবনী—

বুদ্ধ — শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বি-এ

খৃষ্ট „ „ „ যন্ত্রস্থ

মহম্মদ „ „ „ „

ফণোগ্রাফ আবিষ্কর্ত্তা—এডিসন ও তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্রনির্ম্মাতা মারকনি

বঙ্কিম প্রসঙ্গ— সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

গল্প, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি—

অধ্যাপকের বিপত্তি — শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১

মোতিকুমারী — ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার

তোড়া — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ

অকৃতজ্ঞ — „ ফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ

মণিহারা

টলষ্টয়ের গল্প — „ দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ

মঙ্গোপার্কের ভ্রমণ বৃত্তান্ত— যন্ত্রস্থ

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এ. ম

প্রকাশক—

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোং

১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।